HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ০১ প্রত্যয় কী?

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: প্রত্যয় কী?

টপিক ০২: সমাজকল্যাণ

টপিক ০৩: সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ও এর গুরুত্ব

টপিক ০৪: দান

টপিক ০৫: সদকা

টপিক ০৬:জাকাত

টপিক ০৭:সরাইখানা

টপিক ০৮:দেবোত্তর

টপিক ০৯:বায়তুল মাল

টপিক ১০:এতিমখানা

টপিক ১১:সমাজসেবা ও সমাজকর্ম

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১২: সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্ম
টপিক ১৩: সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকর্ম
টপিক ১৪: সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজকর্ম
টপিক ১৫: সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজকর্ম
টপিক ১৬: সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার
টপিক ১৭: সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন
টপিক ১৮: হিন্দু বিধবা বিবাহ আন্দোলন
টপিক ১৯: নারীশিক্ষা আন্দোলন
টপিক ২০: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ২১: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: পেশার ধারণা

This Topic is important for

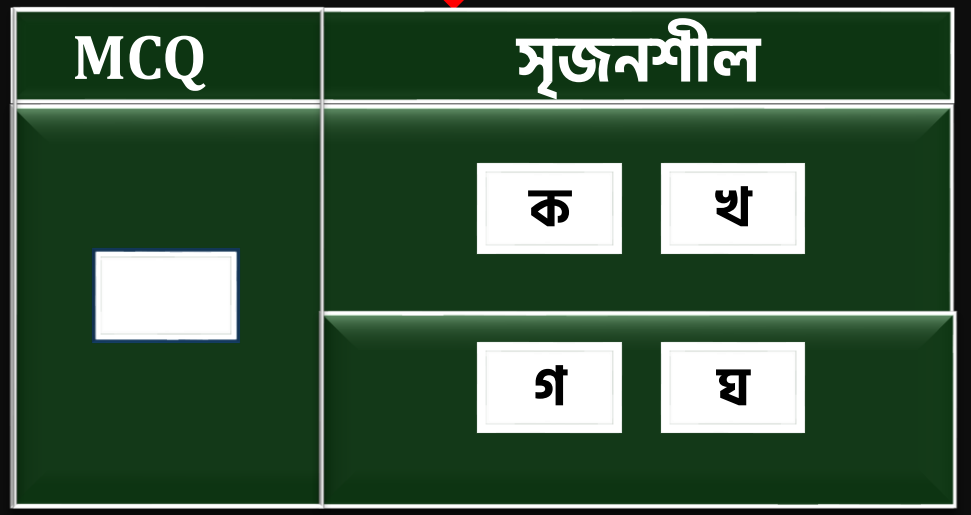

প্রত্যয় কী?

প্রত্যয় হলো পর্যবেক্ষণকৃত ঘটনা, বস্তু বা অভিজ্ঞতার বিমূর্তরূপ। প্রত্যয় হলো বহুমুখী বিভিন্ন ঘটনার সংক্ষিপ্ত প্রতিনিধি। প্রত্যয়ের উদ্দেশ্য অনেকগুলো ঘটনাকে একটি শিরোনামে সংগঠিত করে চিন্তা ও প্রত্যক্ষণ সহজ করা। যখন কোন ঘটনা ব্যাখ্যা, তথ্যের বিবরণ অথবা কোন জটিল বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিমূর্তভাবে প্রকাশ করতে হয়, তখন প্রত্যয় বা ধারণা ব্যবহার করা হয়। বর্ণনামূলক বা ব্যাখ্যাধর্মী প্রত্যয় উদ্ভাবন যে কোন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ দিক। উইলিয়াম পি স্কট (William P Scott) প্রণীত Dictionary of Sociology গ্রন্থের ব্যাখ্যানুযায়ী, "প্রত্যয় হলো একটি শব্দ বা এক সেট শব্দগুচ্ছ, যা কোন বিষয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রকাশ করে। প্রত্যয় কোন ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশ করে।"

সহজভাবে বলা যায়, প্রত্যয় হলো বিভিন্ন ও বহুবিধ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিমূর্ত উপস্থাপন, যার উদ্দেশ্য অনেকগুলো ঘটনা বা বিষয়কে একটি সাধারণ শিরোনামের মাধ্যমে উপস্থাপন করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রত্যক্ষণ ও চিন্তাকে সহজ করা। সমাজকর্মে অসংখ্য প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়। যেমন- সমাজ, সংস্কৃতি, আদর্শ, মূল্যবোধ, ব্যক্তিত্ব, দল ইত্যাদি। উল্লেখ্য দৃশ্যমান ও পর্যবেক্ষণযোগ্য উপাদান সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়গুলো (যেমন ফল, মাছ, গরু, পশু, পাখি) মানুষ সহজে অনুধাবন ও প্রত্যক্ষণ করতে পারেন। অন্যদিকে, গুণগত ও মানসিক উপাদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়গুলো (যেমন বুদ্ধি, আবেগ, ব্যক্তিত্ব) সহজে বোধগম্য হয় না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ০২ সমাজকল্যাণ

টপিক ০২: সমাজকল্যাণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজকল্যাণ

সমাজকল্যাণ এবং সমাজকর্ম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও এক নয়। সমাজকল্যাণ ও পেশাদার সমাজকর্মের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সমাজকল্যাণ একটি ব্যাপক অর্থবাহক প্রত্যয়। সুনির্দিষ্ট ও সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে সমাজকল্যাণ প্রত্যয়টি ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রত্যয়ের মত সমাজকল্যাণ ধারণাটি সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। মনীষীরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে সমাজকল্যাণ প্রত্যয়টির সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। এ্যানসাইক্লোপেডিয়া অব সোশ্যাল ওয়ার্ক গ্রন্থের ব্যাখ্যানুযায়, "সমাজকল্যাণ বলতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ও বাস্তবায়িত সেসব কার্যাবলির সমষ্টিকে বোঝায়, যেগুলো স্বীকৃত সামাজিক সমস্যা সমাধান, প্রতিরোধ বা লাঘবে অথবা ব্যক্তি দল বা সমষ্টির কল্যাণের উন্নতি সাধনে নিয়োজিত। মনীষী জেমস মিজলে (James Midgley) তাঁর 'Social Development' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, সমাজকল্যাণ প্রত্যয়টির আত্মিক এবং বস্তুনিষ্ঠ (Subjective and objective) উভয় দিক রয়েছে। এজন্য সমাজকল্যাণ প্রত্যয়টি বর্ণনাত্মক, গুণাত্মক পরিভাষায় অথবা বাস্তব মূল্যায়নের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করতে হয়। সমাজকল্যাণ প্রত্যয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু'টি বিমূর্ত ধারণা হলো সমাজ (Society) এবং কল্যাণ (Welfare)। এ দু'টি বিমূর্ত ধারণা বিশ্লেষণ করলে সমাজকল্যাণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব।

সমাজকল্যাণ

সমাজ বলতে সমস্বার্থ ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ জনসমষ্টিকে বোঝায়; যাদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া (Social Interaction) সংঘটিত হয়। সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক ম্যাকাইভারের মতে, "মানুষ যেসব সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে জীবন ধারণ করে, সেগুলোর সংগঠিত রূপই সমাজ।" তিনি পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের প্রবাহ (Web of social relationships) হিসেবে সমাজকে আখ্যায়িত করেছেন। পারস্পরিক সম্পর্ক ও মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মানুষ সমাজ গঠন করে। আর পারস্পরিক সম্পর্ক ও মিথষ্ক্রিয়ার প্রভাবে সৃষ্ট নেতিবাচক অবস্থা থেকে দেখা দেয় সমস্যা। যা সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে।

'কল্যাণ' ধারণাটি একটি আপেক্ষিক মানসিক অবস্থাকে (A state of mind) নির্দেশ করে। মানুষের তৃপ্তি, সন্তুষ্টি ও সুখানুভূতির সঙ্গে কল্যাণ ধারণাটি সংশ্লিষ্ট। অন্যদিকে মানুষের মানসিক তৃপ্তি, সন্তুষ্টি, সুখানুভূতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত হলো প্রয়োজন বা চাহিদা, যাকে বলা হয় সমস্যা। সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী কল্যাণ (Welfare) অর্থ দৈহিক স্বাস্থ্য, সন্তোষজনক আবেগীয় অবস্থা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং এগুলো অর্জনের জন্য সমাজ গৃহীত কার্যক্রম।

সমাজকল্যাণ

'সমাজ' এবং 'কল্যাণ' এ দু'টি ধারণার উপরোক্ত বিশ্লেষণ হতে সমাজকল্যাণের ব্যাখ্যায় বলা যায়, ‘‘সমাজকল্যাণ হলো সমাজের সদস্য হিসেবে সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট নেতিবাচক সামাজিক অবস্থা মোকাবেলার মাধ্যমে অর্জিত সমষ্টিগত ইতিবাচক মানসিক অবস্থা।’’ সমাজকল্যাণ সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ নির্দেশ করে। ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্ন কল্যাণকর অবস্থাকে সমাজকল্যাণ বলা যায় না।

এ প্রসঙ্গে সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যা উল্লেখ করা যায়। অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী, "সমাজকল্যাণ হলো কোন জনসমষ্টি বা সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণকর অবস্থা।’’ (Social welfare is the state of collective well-being of community or society) ।'

সমাজকল্যাণ

সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা

আধুনিক দৃষ্টিকোণ হতে আমেরিকার বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক রোনাল্ড সি ফেডারিকো (Professor Ronald C Federico) এর মতে, সমাজকল্যাণ হলো সমাজ প্রবর্তিত সরকারি এবং বেসরকারি কার্যক্রম ও প্রচেষ্টা; যেগুলো সমাজের সদস্য এবং সুসংগঠিত সমাজ কাঠামোর অংশগ্রহণকারী হিসেবে মানুষকে অধিক কার্যকর সামাজিক ভূমিকা পালনে সাহায্য করে।২

আলোচ্য সংজ্ঞায় সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে সংগঠিত উভয় ধরনের কার্যক্রমকে সমাজকল্যাণের পরিধিভুক্ত করা হয়েছে। সমাজকল্যাণের যে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি এ সংজ্ঞায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হলো সমাজকল্যাণ কার্যক্রম সমাজ প্রত্যাশিত, অনুমোদিত এবং সমাজ কাঠামোর একটা সংগঠিত অংশ।

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, "সমাজকল্যাণ হলো একটি জাতির সেসব কর্মসূচি, সুযোগ-সুবিধা ও সেবা প্রদানের সুসংগঠিত ব্যবস্থা (System), যা সামাজিক শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনার জন্য অপরিহার্য মৌলিক চাহিদা হিসেবে স্বীকৃত সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যগত চাহিদা পূরণে মানুষকে সাহায্য করে।" (Social welfare is a nation's system of programs, benefits and services that help people to meet those social, economic, educational and health needs that are fundamental to the maintenance of society.)

সমাজকল্যাণ

সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা

আলোচ্য আভিধানিক ব্যাখ্যানুযায়ী সমাজকল্যাণ হলো একটি দেশের জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচির সুসংগঠিত ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা সামাজিক শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনা বজায় রাখার জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যগত মৌলিক চাহিদা পূরণে মানুষকে সাহায্য করে। সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক পরিচিতি ও মর্যাদা অনুযায়ী মানুষ যাতে যথাযথ ভূমিকা পালনের সামর্থ্য অর্জন করতে পারে, সেজন্য সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা সাহায্য করে। সুসংগঠিত ব্যবস্থা হিসেবে সমাজকল্যাণ পরস্পর নির্ভরশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানসিক ইত্যাদি মানবকল্যাণের অপরিহার্য প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের প্রতি সমান গুরুত্ব দেয়। বিচ্ছিন্ন এবং একক কোন দিকের কল্যাণকে সমাজকল্যাণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না।

সমাজকল্যাণ

সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা

সুসংগঠিত কর্মপদ্ধতির হিসেবে সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন আমেরিকার মনীষী ডব্লিউএ ফ্রিডল্যান্ডার (Welter A Friedlander)। তাঁর মতে, সমাজকল্যাণ হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজসেবা প্রদানের এমন এক সুসংগঠিত ব্যবস্থা (System), যার লক্ষ্য ব্যক্তি ও দলকে সন্তোষজনক জীবন ও স্বাস্থ্যমান অর্জনে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক লাভে সহায়তা করা, যা তাদের অন্তর্নিহিত সত্তার পূর্ণ বিকাশ এবং পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের কল্যাণের পথকে উন্নত করতে সক্ষম করে তোলে। (Social Welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standard of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community.)

সমাজকল্যাণ

সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা

আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) প্রকাশিত Encyclopaedia of Social Work (১৯৭১) গ্রন্থে সমাজকল্যাণের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, সাধারণভাবে সমাজকল্যাণ বলতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংগঠিত সকল কার্যাবলিকে নির্দেশ করে, যেগুলো স্বীকৃত সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ, প্রতিকার অথবা সমাধানে অবদান রাখার লক্ষ্যে নিয়োজিত।

সমাজকল্যাণ একটি ব্যাপক ধারণা। মানুষের পরস্পর সম্পর্কযুক্ত চাহিদা পূরণে গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয়ে গঠিত সুসংগঠিত ব্যবস্থা হলো সমাজকল্যাণ। সমাজকল্যাণ এমন একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থা (Organized system), যে ব্যবস্থা মানবকল্যাণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, দৈহিক, মানসিক প্রভৃতি সামগ্রিক দিক নিয়ে ব্যাপৃত। ব্যক্তি মানুষকে সামাজিক পরিবেশের উপযোগী এবং সামাজিক পরিবেশকে মানবোপযোগী ভূমিকা পালনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলতে সাহায্য করার সুসংগঠিত ব্যবস্থাই সমাজকল্যাণ।

সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমাজকল্যাণ একটা সুসংগঠিত কর্মব্যবস্থা (Organized system of programms), যার লক্ষ্য সমাজের সকল মানুষকে কার্যকর সামাজিক ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানসিক চাহিদা পূরণে সাহায্য করা। সামাজিক সংহতি, সামাজিক শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণে যথাযথ ভূমিকা পালনে মানুষকে সাহায্য করাই সমাজকল্যাণের লক্ষ্য। সমাজভেদে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের হয়। ফলে সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সমাজকল্যাণের সাধারণ লক্ষ্য হলো সমাজের প্রত্যেক মানুষের সামাজিক, আর্থিক, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদনের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করা। সমাজকল্যাণের ব্যাপক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে WA Friedlander বলেছেন, "সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্য হলো সমাজের প্রত্যেক মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ, স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার উন্নতমান অর্জন, অন্যের অধিকার ক্ষুন্ন না করে সকল নাগরিকের সমান অধিকার, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ আত্মমর্যাদা, চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা।""

সমাজকল্যাণ

সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মানব জীবনের বিভিন্ন দিক অর্থাৎ সামাজিক, আর্থিক, মানসিক, দৈহিক, আধ্যাত্মিক প্রতিটি দিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বিচ্ছিন্ন এবং সম্পর্কহীনভাবে একদিকের কল্যাণ করা হলে, অন্যদিকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এজন্য সুসংগঠিত ব্যবস্থা (System) হিসেবে সমাজকল্যাণ মানব জীবনের সবদিকের কল্যাণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সমাজকল্যাণ বলতে শুধু জীবনের নির্দিষ্ট দিকের অপেক্ষাকৃত উন্নততর অবস্থাকে বোঝায় না; বরং সামগ্রিক দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক মঙ্গলজনক অবস্থাকে বোঝায়।

সমাজকল্যাণ

সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমাজকল্যাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য মৌল চাহিদা পূরণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, যাতে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতাজনিত সমস্যা প্রতিরোধ করা যায়। জাতিসংঘ গৃহীত সমাজকল্যাণের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে "সমাজকল্যাণের পরিধিভুক্ত হলো সেসব সুসংগঠিত কার্যক্রম, যেগুলোর লক্ষ্য ব্যক্তি বা জনসমষ্টিকে তাদের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে এবং পরিবার ও সমাজের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের কল্যাণকে উন্নত করা।"*

মনীষী চালর্স ডি গারভিন বলেছেন, সমাজকল্যাণ হলো সমাজের সদস্যদের মৌল চাহিদা- খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও ব্যক্তিগত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সমাজ গৃহীত সুসংগঠিত ব্যবস্থার ধরন।'

প্রত্যেক সমাজেই বিশেষ শ্রেণির দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠী বসবাস করে। সমাজকল্যাণ কর্মসূচির সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের দুঃস্থ দরিদ্র শ্রেণির মৌল চাহিদা পূরণে সাহায্য করা। মনীষী রবার্ট মরিস (Robert Morris) সমাজকল্যাণের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "সমাজকল্যাণ হলো সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত সেসব কার্যক্রম, যেগুলো দারিদ্র্য ও দুঃস্থাবস্থা হ্রাসে মানুষকে সাহায্য করে। যে অবস্থা সংশ্লিষ্টদের শ্রম দ্বারা অথবা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা মৌল চাহিদা পূরণে তাদের অক্ষম করে তোলে।"

সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমাজে এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যারা অস্বাভাবিক আচরণের মাধ্যমে সামাজিক শৃংখলার প্রতি হুমকির সৃষ্টি করে। সমাজকল্যাণ এসব অস্বাভাবিক লোকদের চিহ্নিত এবং অস্বাভাবিক অবস্থা দূরীকরণে সাহায্য করে, যাতে তারা সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণে হুমকি বা বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের মানসিক হাসপাতাল, অপরাধ সংশোধন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাভাবিক হতে সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা সাহায্য করে।

সমাজকল্যাণের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হলো দরিদ্র, অসহায়, ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠীকে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করা। ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সামর্থ্য শক্তিশালীকরণে সাহায্য করা। সমাজে প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ সমাজকল্যাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। আমেরিকার মনীষী সি ম্যারে (C Murray) সমাজকল্যাণ পরিভাষাটি সমাজে প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সুষম বন্টনের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, “ সমাজের মূল্যবান সম্পদ যেমন অর্থ, কর্মসংস্থান, গৃহায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সমাজসেবার মতো মূল্যবান সম্পদ বন্টনের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাই সমাজকল্যাণ।”

সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের সম্পর্ক

সমাজকল্যাণ এবং সমাজকর্ম উভয়ে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োজিত। উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।

আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি-NASW প্রকাশিত সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যা হতে সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের সম্পর্ক ও পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, "সমাজকল্যাণ হলো একটি জাতির সেসব কর্মসূচি, সুযোগ-সুবিধা ও সেবা প্রদানের সুসংগঠিত ব্যবস্থা বা সিসটেম, যে ব্যবস্থা সামাজিক শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার জন্য অপরিহার্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্যগত চাহিদা পূরণে সাহায্য করে।"

অন্যদিকে, উক্ত অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী, "সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান, যা মানুষকে মনোঃসামাজিক ভূমিকা পালনের একটা কার্যকর পর্যায়ে উপনীত হতে ও সকল মানুষের কল্যাণকে শক্তিশালী করতে ফলপ্রসূ সামাজিক পরিবর্তন সাধনে সাহায্য করে।

সমাজকল্যাণ বিজ্ঞান বা পেশা নয় বরং কোন দেশের সামগ্রিক কল্যাণমূলক সেবা প্রদান ব্যবস্থা বা সিসটেম। বৈজ্ঞানিক ও পেশাগত সমাজসেবা কার্যক্রম সমাজকল্যাণের পরিধিভুক্ত। সমাজকল্যাণকে দেশের সুসংগঠিত সামগ্রিক সাহায্যদান ব্যবস্থা (Organized helping system) হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের সম্পর্ক

সমাজকল্যাণ হলো একটা বৃহত্তর সিসটেম। সমাজকর্ম হলো একটা ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও পেশা। বৃহত্তর 'সমাজকল্যাণ সিসটেমের একটা উপাদান হলো সমাজকর্ম। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে নিয়োজিত যাবতীয় পেশাদার-অপেশাদার সেবাকর্ম বৃহত্তর সমাজকল্যাণ সিসটেমের পরিধিভুক্ত। সমাজকর্ম একটি স্বীকৃত সমাজকল্যাণ পেশা বিধায় এতে শুধু পেশাদার সমাজকর্মীদের কাজের স্বীকৃতি রয়েছে। তবে সমাজকর্মের বিকাশ সমাজকল্যাণের ব্যাপক পরিধির প্রেক্ষাপটে সাধিত হয়।

সমাজকল্যাণের বৃহত্তর লক্ষ্যার্জনের বিভিন্ন পেশা যেমন আইন, চিকিৎসা, প্রকৌশল প্রভৃতি নিয়োজিত। সমাজকর্ম সমাজকল্যাণে নিয়োজিত অনুরূপ একটি পেশা। সমাজবিজ্ঞানী স্কিডমোর, থ্যাকারী, উইলিয়াম ফেয়ারলী প্রমুখ মনীষীদের মতামত হতে সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের সম্পর্ক বোঝা যায়। তারা বলেছেন, সমাজকল্যাণ বৃহৎ অর্থ বহন করছে, যার অন্তর্ভুক্ত হলো সমাজকর্ম, জনকল্যাণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কল্যাণমূলক কর্মসূচি ও কার্যক্রম। অন্যদিকে, "সমাজকর্ম একটি পেশাগত উদ্যোগ, যা সামাজিক ভূমিকা পালন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে সামাজিক সম্পর্ক শক্তিশালীকরণ এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে মানুষকে সাহায্য করে।"১০

সমাজকল্যাণ

সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের সম্পর্ক

সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে উভয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সমাজকর্ম বিশেষজ্ঞদের পরিভাষায়, "সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে ব্যাপক সংখ্যক পেশাদার ও টেকনিসিয়ান নিয়োগ দেয়া হয়। যাদের মধ্যে বেশিরভাগ হলো পেশাদার সমাজকর্মী। সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের মূল কেন্দ্র বা প্রাণস্বরূপ হলো সমাজকর্ম পেশা।"

এ্যানসাইক্লোপেডিয়া অব সোশ্যাল ওয়ার্ক (Encyclopaedia of Social Work-1971) গ্রন্থের সংজ্ঞানুযায়ী, "সমাজকল্যাণ বলতে সাধারণভাবে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত সেসব সুসংগঠিত কার্যাবলির সমষ্টিকে বোঝায়, যেগুলো স্বীকৃত সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ, প্রতিকার বা সমাধানে অথবা ব্যক্তি দল বা সমষ্টির কল্যাণের উন্নতি বিধানে নিয়োজিত। আর এ জাতীয় সুসংগঠিত কার্যক্রমে বিভিন্ন পর্যায়ের যেমন চিকিৎসক, নার্স, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, আইনবিদ প্রমুখ পেশাদার ব্যক্তিদের ব্যবহার করা হয়।"১১ সুতরাং বলা যায় সমাজকল্যাণের বৃহত্তর লক্ষ্যার্জনে অন্যান্য পেশার মতো সমাজকর্ম একটি পেশা এবং বৃহত্তর সমাজকল্যাণ সিসটেমের একটি উপাদান।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ০৩ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ও এর গুরুত্ব

টপিক ০৩: ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ও এর গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ও এর গুরুত্ব

শিল্পবিপ্লব মানব সভ্যতাকে সরাসরি সীমারেখা টেনে 'প্রাক-শিল্পযুগ' এবং 'শিল্প বিপ্লবোত্তর যুগ'- এ দু'ভাগে ভাগ করেছে। মানব সভ্যতার মতো সমাজসেবার ধারাকে শিল্পবিপ্লব দু'ভাগে বিভক্ত করে। একটি হল, মানব প্রেম ও ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে পরিচালিত প্রাকশিল্প যুগের ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ ধারা। আর অন্যটি হল, শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজের জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে উদ্ভুত বিজ্ঞানসম্মত পেশাদার সমাজকল্যাণ ধারা। প্রাকশিল্প যুগের ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রথা এবং প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও বিকাশের সঠিক বিবরণ দেয়া কঠিন। মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্য ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের মূলভিত্তি বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ও এর গুরুত্ব

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ ধারণা: প্রাক-শিল্পযুগের বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত সমাজসেবা প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলো ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রথা হিসাবে পরিচিত। ধর্মীয় অনুশাসন ও মানবতাবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত বদান্যতা নির্ভর (Based on philanthrophy) যে সব সমাজসেবামূলক প্রথা-প্রতিষ্ঠান প্রাচীনকাল হতে পরিচালিত হয়ে আসছে, সেগুলোকে ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ বলা হয়। মানুষের সহজাত মানবতা, ধর্মীয় অনুশাসন ও বিশ্বাস এবং মানবপ্রেম ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রথা-প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি। দান, জাকাত, এতিমখানা, ওয়াক্ত, দেবোত্তর প্রথা, লঙ্গরখানা ইত্যাদি ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের দৃষ্টান্ত। ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ ধারা প্রধানত সেসব শ্রেণির লোকদের সাহায্য করে যারা নিজেদের দায়িত্ব বহনে অক্ষম। তবে অনেক ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রথা রয়েছে, যেগুলো সর্বস্তরের জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত।

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ হতে এগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সবগুলো উদ্দেশ্যই এক এবং অভিন্ন। আর তা হলো আর্তমানবতার সেবার মাধ্যমে ইহলোকিক পাপ মোচন এবং পারলৌকিক পূণ্য অর্জন।

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ও এর গুরুত্ব

ধর্মীয় অনুশাসন ও মানব প্রেমের ভিত্তিতে ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালিত। সম্পদশালী দানশীল ও মানবহিতৈষী ব্যক্তির ইচ্ছানির্ভর অসংগঠিত এবং বিচ্ছিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম। ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং করুণা নির্ভর। আর্থিক সাহায্যদানের মাধ্যমে সমস্যার সাময়িক সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়। ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ কার্যক্রমে স্বাবলম্বনের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বিশেষ শ্রেণির কল্যাণে ও সীমিত পরিসরে সনাতন সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ ধারায় বিচ্ছিন্ন ও অসংগতি সমাজসেবার পাশাপাশি সংগঠিত সমাজসেবারও উপস্থিতি রয়েছে। যেমন- জাকাত, বায়তুল মাল, ধর্মগোলা ইত্যাদি।

কাজ

দলীয় : কাজ-১ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের দুটি উদাহরণ দাও।

কাজ-২ : উদাহরণ হিসেবে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান দুটির কার্যক্রম কী?

উদাহরণ-১	কাজ-১
উদাহরণ-২	কাজ-২

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ও এর গুরুত্ব

ঐতিহ্যগত ও পেশাদার সমাজকর্ম উভয়েই আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত দু'টি সাহায্যদান প্রক্রিয়া। উভয় সামজকল্যাণ ধারার মধ্যে প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতির দৃষ্টিকোণ হতে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পর্কও রয়েছে। প্রাকশিল্প যুগের ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ ধারার উপর ভিত্তি করেই শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশ। এজন্য ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ ধারাকে পেশাদার সমাজকর্মের সর্বজনীন ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ধর্মীয় অনুশাসন ও মানবপ্রেমের ভিত্তিতে পরিচালিত ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ আর্ত-মানবতার সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এগুলোর কতকগুলো দুর্বল দিক রয়েছে। ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা হলো অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন সমাজসেবা কার্যক্রম'। ঐতিহ্যগত সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল বিধায় আধুনিক শিল্প সমাজের জটিল সমস্যা মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ০৪ দান

টপিক ০৪: দান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

দান

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দান (Charity) অন্যতম। বিশ্বের সব সমাজে এবং সকল ধর্মে এর নিদর্শন পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন নামে দান পরিচিত হলেও এর মূল লক্ষ্য আর্ত-পীড়িত অসহায় মানুষের কল্যাণে সাহায্য করা। খ্রিস্টান ধর্মে চ্যারিটি, হিন্দু ধর্মে দান এবং ইসলাম ধর্মে খয়রাত, সাদকাহ প্রভৃতি দান প্রথার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দান

দান প্রথা কী?

দান প্রথার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Charity' যা ল্যাটিন শব্দ 'Charitas' হতে এসেছে। 'Charitas' অর্থ মানবপ্রেম। Charity-র আক্ষরিক অর্থ হলো, 'Love for one's fellow humans' "অসহায় ও সমস্যাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণার্থে নিঃশর্তভাবে সাহায্য করার মাধ্যমে যে মানবপ্রেম প্রকাশ পায়, তা হচ্ছে চ্যারিটি বা দান।"১২ সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞানুযায়ী, "Charity is the donation of goods and services to those in need." দান হলো নিঃশর্তভাবে অপরের কল্যাণে কোন কিছু স্বত্ব ত্যাগ করে প্রদান করার প্রথা। সম্পদশালী এবং মানবহিতৈষী দানশীল ব্যক্তির ইচ্ছানির্ভর অসংগঠিত ও অপরিকল্পিত বৈষয়িক সাহায্য প্রদানই হলো দান প্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় অনুপ্রেরণা এবং মানবপ্রেমের সর্বজনীন আদর্শ মানুষকে দানশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে। দান প্রথার মাধ্যমে মানুষ ইহলৌকিক প্রশান্তি এবং পারলৌকিক মুক্তি লাভের বাসনা চরিতার্থ করে।

দান

দান প্রথা গুরুত্ব

আধুনিক দৃষ্টিতে দান প্রথার কিছু দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলেও সমাজকর্মের বিকাশে দানপ্রথার অবদান অস্বীকার করা যায় না। দান প্রথার সহানুভূতি ও করুণাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় দান সংগঠন আন্দোলন (Charity Organization Movement) গড়ে উঠতে অনুপ্রেরণা যোগায়। যার ফলে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পেশাদার সমাজকর্ম ধারার সূচনা হয়। সামাজিক সমস্যা সমাধান, দুঃস্থ অসহায় মানুষের প্রয়োজন পূরণ এবং জনকল্যাণের ঐতিহ্যগত পদ্ধতি হলো দান প্রথা। অভাবগ্রস্তদের সাহায্য ও সেবা প্রদানে জনগণকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো দান প্রথার মূল লক্ষ্য। দান মানব ইতিহাসের মত সুপ্রাচীন সমাজসেবা। মানুষের সহজাত মানবতাবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসন হলো দান প্রথার সর্বজনীন ভিত্তি। এ সি আনল।

দান

দান প্রথা গুরুত্ব

*দান যেমন ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরিচালিত হয়, তেমনি সংগঠনের মাধ্যমেও দুঃস্থ অসহায় মানুষের কল্যাণসাধন করা হয়। এতিম, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, অক্ষম প্রভৃতি অসহায় শ্রেণির মানুষের কল্যাণে প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য কার্যক্রম দান প্রথার মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দান প্রথার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার দান সংগঠন সমিতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। দান সংগঠন সমিতি (Charity Organisation Society-COS) সমাজসেবার ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশল প্রয়োগ করে। যার ফলে পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশ ঘটে। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা সামাজিক দান প্রভাবিত হলেও বর্তমানে এটি ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। বিভিন্ন ধর্মের দানপ্রথার ভিত্তিতে পরিচালিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক সংগঠন রয়েছে, যেগুলো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল দুঃস্থ অসহায় মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে। আধুনিক বিশ্বে দান প্রথার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বেসরকারি সংগঠনসমূহ (এনজিও) দুঃস্থ মানুষের জন্য উপার্জনশীল কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন ধরনের সাহায্য দিয়ে থাকে।

দান

দান প্রথা গুরুত্ব

বাংলাদেশে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুশাসনে অনুপ্রাণিত হয়ে জনগণ প্রতি বছর স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপুল পরিমাণ সম্পদ দান করে। সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে এসব দান সংগ্রহ এবং বিনিয়োগ করা হলে, আর্তমানবতার কল্যাণে দান কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম। বাংলাদেশের মতো অনুন্নত ও দরিদ্র দেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সীমিত বলে দান প্রথা দুঃস্থ, অসহায় ও দরিদ্র শ্রেণির সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ০৫ সদকা

টপিক ০৫: সদকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সদকা

সকা ইসলামী সমাজব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমাজসেবামূলক প্রথা। বিশ্বের সকল মুসলিম সমাজে সদ্‌ক্কা প্রচলিত রয়েছে। সদ্‌কা জাকাতের মতো বাধ্যতামূলক নয়। সদকা ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নফল ইবাদত। আগের চাইতে

সদকা

সদকা কী?

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় দান প্রথারই বিশেষ রূপ সদ্‌কা। সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে মুসলমানগণ দুঃস্থ-অসহায় মানুষকে বৈষয়িক যা দান করে তাই সঙ্কা। নিজের অধিকারের উপর অন্যের অধিকারকে প্রাধান্য দিয়ে কোন কিছু দান করার নামই সদ্‌কা। ইসলামে স্বেচ্ছায় দান এবং বাধ্যতামূলকভাবে (সাদাকাতুল ফিতর) প্রদত্ত দান উভয়কে সদ্‌কা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সদকা

সদকা গুরুত্ব

সমাজের দুঃস্থ-অসহায় শ্রেণির কল্যাণে সঙ্কা প্রচলিত রয়েছে। সদ্স্কার মাধ্যমে সমাজের দুঃস্থ, অসহায় দরিদ্রদের প্রতি সম্পদশালীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এজন্য ইসলাম ধর্মে সদ্স্কার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামের বিধান মোতাবেক মানুষের দু'টি কর্তব্য রয়েছে। স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য (হক্কুল্লাহ) এবং সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য (হক্কুল ইবাদ)। সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালনের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের প্রধান উপায় সদ্স্কা বা দান। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ হতে সদকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে।

ইসলামে জাকাত হচ্ছে বাধ্যতামূলক। সাধারণত ফরজ আদায় করতে গিয়ে মানুষ জাকাত দিয়ে থাকে। সদকা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানবতার সেবায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। অনেক সময় সমাজে এমন অবস্থা বা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে, তখন শুধু জাকাতের অর্থে সে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব না-ও হতে পারে। এ অবস্থায় যদি মানুষ সাধারণ দানে উৎসাহিত না হয়, তাহলে সমাজের অধিকাংশ লোক ন্যূনতম মৌল চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। ধনী সম্প্রদায়ের উপর জাকাত ব্যতীতও গরীবদের প্রতি অতিরিক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, এ অনুভুতি সদ্স্কার মাধ্যমে জাগিয়ে তোলা যায়। যাদের উপর জাকাত ফরজ নয় অথচ তারা স্বচ্ছল, দরিদ্র ও দুঃস্থদের প্রতি তাদের যে কর্তব্য রয়েছে, সমাজের সেটি স্মরণ করানোর জন্যই ইসলাম সদকা বা দানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে।

সদকা

সদকা গুরুত্ব

এমন অনেক সঙ্কা রয়েছে সম্মিলিতভাবে সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা করা হলে সেগুলো সমাজের কল্যাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম। যেমন রমজানের ঈদের সময় প্রদত্ত সাদাকাতুল ফিতর। এটি খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আদায় ও বিতরণের ব্যবস্থা করা হতো। ইমাম বুখারী (র:) লিখেছেন, ইসলামী খিলাফতের যুগে এ সদকা বায়তুল মালে জমা করে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী এলাকার গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। বর্তমানে বাংলাদেশে এ জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে, সদকার অর্থ গরীবদের কল্যাণে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ০৬ জাকাত

টপিক ০৬:জাকাত

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

জাকাত

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জাকাত অন্যতম। জাকাত একদিকে ইসলামের মৌলিক এবাদত, অন্যদিকে কণ্যাণমুখী ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি। ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য জাকাতের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইসলাম ধর্মে জাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক।

জাকাত

জাকাত কী?

আরবী 'জাকাত' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো 'বৃদ্ধি' এবং 'পবিত্রতা'।
পবিত্রতা অর্থে জাকাত : মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই অর্থলিপ্স ও কৃপণ স্বভাবের হয়ে থাকে। সে নিজের উপার্জিত সম্পদ নিঃস্বার্থভাবে অন্যকে দিতে চায় না। তাই আল্লাহর নির্দেশকে তার পার্থিব মোহের উপর প্রাধান্য দিয়ে, অর্থ ব্যয় করলে একদিকে যেমন তার অন্তর কৃপণতা ও অর্থলিপ্সা হতে পবিত্র হয়, তেমনি তার সম্পদ কলুষমুক্ত হয়ে পবিত্র হয়। এ দৃষ্টিকোণ হতে জাকাত অর্থ পবিত্রতা।

জাকাত

জাকাত কী?

বৃদ্ধি অর্থে জাকাত : সমাজে ধন-সম্পদের আবর্তন ও বিস্তার সাধনের লক্ষ্যেই ধনীদের উপর জাকাত ফরয করা হয়েছে। সমাজের সম্পদশালী শ্রেণি জাকাত দান করে দরিদ্র ও অসহায় শ্রেণির অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান ছাড়াও সমবেত প্রচেষ্টায় এবং পরিকল্পিত উপায়ে দরিদ্রদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এতে সম্পদ ধনী শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত না হয়ে সমাজের অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দরিদ্র ও দুঃস্থ শ্রেণির অর্থাগমের ব্যবস্থা হয়। এদিক হতে জাকাত অর্থ বৃদ্ধি।

ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায়, "ঋণও যাবতীয় প্রয়োজন নির্বাহের পর নির্দিষ্ট পরিমাণ (নিসাব পরিমাণ) কোন অর্থ কারো নিকট পূর্ণ এক বছর যাবত সঞ্চিত থাকলে, তার নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্দেশিত পথে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যয় করার বিধানই জাকাত।" অন্যভাবে বলা যায়, "ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কোন মুসলমানের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকলে, নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট শ্রেণির মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে বিতরণ করার বিধানই জাকাত।" পবিত্র হাদিস অনুযায়ী সঞ্চিত ধন সম্পদের উপর পূর্ণ এক বছর ঘুরে না আসা পর্যন্ত জাকাত দান ফরজ হয় না।

জাকাত

জাকাত কী?

জাকাত আদায়ের খাত: জাকাত মুসলিম সমাজের ধনীদের নিকট হতে আদায় এবং সে সমাজের দরিদ্রদের মধ্যে কটন করা হয়। ১৪

পাঁচ শ্রেণির সম্পদের উপর জাকাত দান ফরজ। যেমন-

১. স্বর্ণ, রৌপ্য ও নগদ অর্থ; ২. গৃহপালিত পশু; ৩. উৎপন্ন ফসল; ৪. ব্যবসায়িক পণ্য; ৫. খনিজ দ্রব্য।

১. স্বর্ণ, রৌপ্য ও নগদ অর্থ: যে কোনভাবে অর্থাৎ অলংকার বা স্বর্ণের খন্ড অথবা গলানো স্বর্ণের বার আকারে সাড়ে সাত তোলা (বিশ মিছকাল) স্বর্ণ জমা থাকলে, তার উপর শতকরা আড়াই ভাগ স্বর্ণ বা মূল্য জাকাত হিসেবে দান করা বাধ্যাতামূলক। যে কোন ভাবে ৫২২ তোলা রৌপ্য থাকলে তার শতকরা আড়াই ভাগ বা সম-পরিমাণ মূল্য জাকাত হিসেবে দান করতে হবে। যদি স্বর্ণ ও রৌপ্য উপরোক্ত পরিমাণ না থাকে, তাহলে উভয়ের পরিমাণ ৫২২ তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমান হলে, তার উপর জাকাত দেয়া বাধ্যতামূলক। নগদ অর্থ, ব্যাংক, বীমা, বৈদেশিক মুদ্রা বা জমা অর্থের উপর জাকাত দান ফরজ।

জাকাত

জাকাত কী?

২. গৃহপালিত পশু : বংশ বৃদ্ধি বা লাভজনক উদ্দেশে পশু পালন করলে গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার জাকাত দিতে হবে। গৃহপালিত পশুর সংখ্যার উপর জাকাত নির্ধারিত হয়। প্রতি ৩০ টি গরু বা মহিষের জন্য একটি এক বছরের অধিক বয়সের বাছুর জাকাত দান ফরজ। প্রতি ৪০ টি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বার জন্য একটি এক বছর বয়সের ছাগল জাকাত হিসেবে দিতে হয়।

৩. উৎপন্ন ফসল: বিনা সেচে বা প্রাকৃতিক ক সেচের মাধ্যমে ফসল ফললে তার সেচের ফলে উৎপন্ন ফসলের ভাগ জাকাত দান ফরজ।

৪. ব্যবসায়িক পণ্য : ব্যবসায়িক পণ্য বা মূলধনের পরিমাণ ৫২ ১/২ মূল্যের সমান হলে তার শতকরা আড়াই ভাগ জাকাত দান করতে হয়। ১ তোলা রৌপ্য বা ৭২ তোলা স্বর্ণের

৫. খনিজ দ্রব্য: কোন জমিতে খনিজ দ্রব্য, গুপ্তধন বা অনুরূপ সম্পদ পাওয়া গেলে তা 'ব্যবহারের পূর্বে ভাগ জাকাত হিসেবে দান করা ফরজ।'

জাকাত

জাকাত কী?

জাকাত ব্যয়ের খাত: পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, "জাকাতের অর্থ দরিদ্র ও মিসকীনদের জন্য, জাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের জন্য, ইসলামের প্রতি মন আকৃষ্ট করার জন্য, দাসত্ব মুক্তির জন্য, ঋণমুক্তির জন্য আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের জন্য ব্যয়িত হবে।" পবিত্র কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী জাকাত প্রাপ্যরা হচ্ছে- ১. দরিদ্র ও নিঃস্ব শ্রেণি, ২. ইসলামের প্রতি মন আকৃষ্ট করার প্রয়োজনে এবং নব্য মুসলিম, ৩. দাসত্ব মোচনের জন্য, ৪. ঋণগ্রস্তদের ঋণমুক্ত করার জন্য, ৬. বিপদগ্রস্ত পথিক, ৭. জাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারী ৮. যারা অর্থাভাবে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম।

জাকাত

জাকাত গুরুত্ব

জাকাতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক গুরুত্ব ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। জাকাত দানের মাধ্যমে মানুষ পারস্পরিক ভাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি, সহনশীলতা, মিতব্যয়িতা, সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি গুণাবলি অর্জন করে। এসব গুণাবলি সমাজ জীবনের সংহতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। জাকাত সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স:) ঘোষণা করেন, "জাকাত দেয়া প্রতিটি মুসলমানের জন্য যেমন একটি কর্তব্য, তেমনি জাকাত প্রাপ্যদের জন্য এটি একটি অধিকার। জাকাতের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি ও সমন্বয় বজায় থাকে।" জাকাত দান ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। এটি ইসলামে বাধ্যতামূলক।

জাকাত

জাকাত গুরুত্ব

জাকাত ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সুষম বন্টনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এতে সম্পদ সমাজের মুষ্টিমেয় লোকদের মধ্যে কুক্ষিগত হতে পারে না। সামাজিক ক্ষেত্রে জাকাত দরিদ্রতা দূর করে সামাজিক সংহতি, প্রগতি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার উত্তম পন্থা হলো জাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। জাকাত সম্পদশালীদের লোভ-লালসা এবং সম্পদ লাভের আকাঙ্খাকে অবদমিত করে। সমাজের অসহায়, বঞ্চিত ও নিঃস্ব শ্রেণির কল্যাণে সম্পদশালীদের সচেতন করে তোলে। এভাবে জাকাত মানুষের নৈতিকতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাকাত -মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি জাগ্রত করে। ফলে সমাজে অন্যায়-অবিচার ও শোষণের প্রবণতা হ্রাস পায়। এতে সমাজের শৃঙ্খলা বৃদ্ধি এবং সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পায়। জাকাত অলস অর্থকে চালু বা গতিশীল করে। জাকাত ব্যবস্থা চালু থাকলে অলসভাবে অর্থ জমা এবং তা থেকে প্রতি বছর জাকাত দান করে জমানো টাকা হ্রাস করতে কোন মানুষ চাইবে না বরং মানুষ স্বাভাবিকভাবে জমানো টাকা অলসভাবে ফেলে না রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানায় বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হবে। এতে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হবার সম্ভাবনা,

জাকাত

জাকাত গুরুত্ব

মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে ইসলামী বিধান মোতাবেক জাকাত সংগ্রহ এবং বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে দারিদ্র্য ও ভিক্ষাবৃত্তির মতো সমস্যা পর্যায়ক্রমে সমাধান করা সম্ভব। বাংলাদেশে ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে মুসলমানগণ প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ বিচ্ছিন্নভাবে জাকাত হিসেবে দান করে থাকেন। সাধারণত নিম্নমানের বস্ত্রদানের মধ্যেই জাকাত দান সীমিত থাকে। জাকাত সংগ্রহ এবং বিতরণের সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকায় জাকাতের বিপুল পরিমাণ অর্থ দারিদ্র্য মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। ১৬ বাংলাদেশের জাকাতের বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ এবং পরিকল্পিত উপায়ে দুঃস্ব অসহায়দের কল্যাণে বিনিয়োগ করা হলে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠন অসম্ভব নয়। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারি করে "জাতীয় জাকাত বোর্ড" গঠনের বিধান করেছেন। জাকাত বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের মধ্যে তেমন আগ্রহ সৃষ্টি না হওয়ায় বোর্ড প্রত্যাশা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। জাতীয় জাকাত বোর্ডের প্রতি জনগণের আস্থা এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা গেলে বাংলাদেশে জাকাত দরিদ্র ও দুঃস্থদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

জাকাত

ধর্মগোলা

ধর্মগোলা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান। বৃটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৃটিশ প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন ও কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং বিশ্বযুদ্ধজনিত কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করার লক্ষ্যে ধর্মগোলা গঠন করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে ধর্মগোলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

জাকাত

ধর্মগোলা

ধর্মগোলা হলো একটি বিশেষ শস্যভান্ডার, যাতে মওসুমের সময় স্থানীয় ভিত্তিতে উদ্বৃত্ত শস্য সংগ্রহ করে মজুদ রাখা হত এবং দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাব দেখা দিলে দুর্গতদের মধ্যে তা বিতরণ করা হতো। অনেক সময় খাদ্যশস্য বিনাসুদে ঋণ হিসেবে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হতো এবং মওসুমের সময় তা পরিশোধ করে দিতে হতো। দুর্ভিক্ষ ও আপতকালীন সময়ে অনাহারে অকাল মৃত্যু রোধ করাই ছিল ধর্মগোলার মূল লক্ষ্য।

জাকাত

ধর্মগোলার পটভূমি

বৃটিশ শাসিত ভারতে বিভিন্ন সময়ে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্রিটিশ প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত কারণে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায়শ দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। এর মধ্যে ১৭৭০ সালের (বাংলা ১১৭৬ সাল) এবং ১৯৪২-৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। কুখ্যাত "ছিয়াত্তরের মনান্তর" নামে পরিচিত ১৭৭০ সালের (বাংলা ১১৭৬) দুর্ভিক্ষে এদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে ও পীড়ায় মৃত্যুবরণ করে। ১৯৪২-৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এদেশে দুর্ভিক্ষ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল। ১৯৪৩ সালে (বাংলা ১৩৫০ সন) দুর্ভিক্ষ সাধারণত পঞ্চাশের মন্বন্তর হিসেবে পরিচিত ছিল। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা থেকে মানুষকে রক্ষা করার চিন্তা ভাবনা থেকেই ধর্মগোলার ধারণা উদ্ভাবন করা হয়। দুর্ভিক্ষ ও আপতকালীন সময়ে অনাহারে অকাল মৃত্যু রোধ করার লক্ষ্যে ১৯৪২-৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ধর্মগোলা গড়ে তোলা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত খাদ্য সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য জেলা ও মহকুমা কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে ইউনিয়ন বোর্ডগুলো ধর্মগোলা গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। জনগণের নির্বাচিত 'গ্রামীণ ফুড কমিটি' ধর্মগোলার সার্বিক দায়িত্ব পালন করত। থানা সার্কেল অফিসার এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণ ধর্মগোলা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতেন।

জাকাত

ধর্মগোলার গুরুত্ব

ধর্মগোলা একটি বিশেষ শস্যভান্ডার হিসেবে বিবেচিত হলেও, সমাজকল্যাণে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না। সমাজকল্যাণে ধর্মগোলা ধারণাটির তাৎপর্য বিভিন্ন দিক হতে আলোচনা করা যায়। ধর্মগোলা ছিল একটি সমষ্টিগত শস্যভান্ডার (Community granary)। যা জনগণের পারস্পরিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। দুর্ভিক্ষ ও তীব্র খাদ্য সমস্যা মোকাবেলায় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে ধর্মগোলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। "স্থানীয় ভিত্তিতে স্থানীয় সমস্যার মোকাবেলা" এ নীতির উপর ভিত্তি করে ধর্মগোলার উদ্ভব। "স্থানীয় ভিত্তিতে স্থানীয় সমস্যার মোকাবেলা" আধুনিক সমাজ কল্যাণেরও অন্যতম দর্শন বা নীতি হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমানে ধর্মগোলা না থাকলেও সরকারি উদ্যোগে ধান সংগ্রহ অভিযানকে পরিমার্জিত বা আধুনিক রূপ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

অবিভক্ত বাংলার সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্মগোলা ধারণাটির গুরুত্ব আজও বিদ্যমান। বাংলাদেশে বিরাজমান খাদ্য সমস্যার সমাধান বাহ্যিক সাহায্যের মাধ্যমে দেয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন স্থানীয় উদ্যোগে ধর্মগোলার মতো প্রতিষ্ঠান গঠন করা। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে খাদ্য সমস্যার মোকাবেলায় ধর্মগোলার গুরুত্ব অপরিসীম। সরকারি তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠু নীতিমালার উপর ধর্মগোলার মতো প্রতিষ্ঠান গঠন করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

জাকাত

ধর্মগোলার গুরুত্ব

যেকোন প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগকালীন সময়ে খাদ্য সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে আপতকালীন শস্যভান্ডার গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে প্রচলিত খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধর্মগোলার ধারণা ও নীতি অনুসরণ করা যায়। বাংলাদেশের পল্লীর কৃষকদের বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের প্রধান সমস্যা হলো উৎপাদনী মূলধনের অভাব। এজন্য কৃষি মৌসুমে গ্রামীণ কৃষকরা উচ্চ সুদের হারে ঋণ গ্রহণ করে। ফসল কাটার পর এসব ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ধর্মগোলার মতো প্রতিষ্ঠান এরূপ সমস্যা মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে। ধর্মগোলার ধারণা ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান গঠন করে। সহজ শর্তে কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা গেলে কৃষি উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ধর্মগোলা শুধু আপতকালীন খাদ্যসমস্যা মোকাবেলার ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, এ ব্যবস্থা সম্পদশালী ও ধনী কৃষকদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে। দুর্যোগ ও বিপদকালীন সময়ে এলাকায় জনগণের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করতে ধর্মগোলা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সম্পদশালী কৃষকগণ তাদের উদ্বৃত্ত শস্য ধর্মগোলায় জমা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ০৭ সরাইখানা

টপিক ০৭: সরাইখানা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সরাইখানা

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হলো সরাইখানা। মধ্যযুগে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটেও উন্নত ছিল না। পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যাতায়াত করতে হতো। এছাড়া বিপদ সঙ্কুল পথে ভ্রমণের সময় পথিকদের রাত্রিযাপন, বিশ্রাম, খাওয়া-দাওয়া এবং অসুস্থতার জন্য আশ্রয়স্থলের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় সরাইখানা স্থাপন করা হয়।

সরাইখানা

সরাইখানার অর্থ

প্রাচীন ও মধ্যযুগের পথিক এবং পর্যটকদের বিনামূল্যে আশ্রয়, খাদ্য, পানীয় সরবরাহের জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত সাময়িক আশ্রয় কেন্দ্রকে সরাইখানা বলা হয়। পথিক ও পর্যটকদের রাত্রিযাপন, থাকা-খাওয়া এবং অসুস্থতায় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সরাইখানা

সরাইখানার গুরুত্ব

মধ্যযুগের ফকির-দরবেশ, ধর্মপ্রচারক এবং প্রজাদরদী শাসকগণ পথিক ও ভক্তদের সুবিধার্থে সরাইখানা স্থাপন করতেন। এগুলো হুজরাখানা ও মুসাফিরখানা নামে পরিচিত ছিল। এসব সরাইখানায় বিনা খরচে খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম ও অসুস্থদের সেবাদানের ব্যবস্থা করা হতো। ইসলাম ধর্মের প্রচারকগণ তাদের খানকার পাশে সরাইখানা নির্মাণ করে নব্যমুসলিমদের আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করতেন। শেরশাহ নির্মিত গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হিন্দু-মুসলমানদের জন্য পৃথক সরাইখানা পথিকদের সুবিধার্থে নির্মাণ করা হয়েছিল।

আধুনিক বিশ্বে সরাইখানা না থাকলেও সরাইখানার অনুকরণে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলোকে সরাইখানার পরিমার্জিত বা আধুনিক সংস্করণ বলা যায়। পর্যটকদের জন্য নির্মিত আবাসিক হোটেল, সার্কিট হাউস, রেস্ট হাউজ ইত্যাদি। এগুলোর মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে সরাইখানাতে বিনা খরচে খাদ্য, আশ্রয় ও সেবাদানের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বর্তমানে এ জাতীয় সেবাদান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত। বর্তমানে সরাইখানার মতো প্রতিষ্ঠাগুলোর মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মুনাফা অর্জনের নীতি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ০৮ দেবোত্তর

টপিক ০৮: দেবোত্তর

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

দেবোত্তর

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রথাগুলোর মধ্যে হিন্দু ধর্মের দেবোত্তর প্রথা অন্যতম। দেবোত্তর প্রথার আইনগত ভিত্তি রয়েছে এবং এটি হিন্দু আইনে স্বীকৃত।

দেবোত্তর

দেবোত্তর প্রথা কী?

হিন্দু ধর্মের বিধান অনুযায়ী পাপমোচন, স্বর্গলাভ এবং ভগবানের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দেবতা বা কোন নামে কোন হিন্দুর সম্পত্তি আংশিক বা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করাকে দেবোত্তর বলা হয়। ধর্মীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, অনাথ আশ্রম, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ এবং মানব সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশেই সম্পত্তির দেবোত্তর প্রথায় উৎসর্গ করা হয়।

হিন্দু ধর্মের বিধান অনুযায়ী দেবোত্তর আংশিক দেবোত্তর এবং সার্বিক দেবোত্তর এ দু'ধরনের হয়ে থাকে।

আংশিক দেবোত্তর: কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে সাময়িকভাবে সম্পত্তি উৎসর্গ করার প্রথাই আংশিক দেবোত্তর। এ জাতীয় দেবোত্তর সাধারণত দেবোত্তরকারীর পরিবার পরিজনদের মধ্যে সীমিত থাকে। আংশিক দেবোত্তর সম্পত্তির দেখাশুনার জন্য দেবোত্তরকারী কর্তৃক সেবায়েত নিয়োগ করা হয়।

সার্বিক দেবোত্তর: ধর্মীয় জনহিতকর কাজে স্থায়ী সম্পত্তি দান করাকে হিন্দু ধর্মের বিধান অনুযায়ী সার্বিক দেবোত্তর বলা হয়। সার্বিক দেবোত্তর সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য সরকার মনোনীত সেবায়েত নিয়োগ করা হয়।

দেবোত্তর

দেবোত্তর প্রথা কী?

বাংলাদেশে দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা: দেবোত্তর হিন্দু আইনে স্বীকৃত এবং হিন্দু আইন অনুযায়ী এটি পরিচালিত। দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনকারীকে সেবায়েত বলা হয়। বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে ওয়াকফ প্রশাসক দেবোত্তর সম্পত্তির সার্বিক রক্ষাণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষাণাবেক্ষণের কোনরূপ জটিলতা দেখা দিলে ওয়াকফ প্রশাসক হস্তক্ষেপ করতে এবং সম্পত্তির সরকারি পর্যায়ে সেবায়েত নিয়োগ করতে পারেন।

দেবোত্তর

দেবোত্তর প্রথা গুরুত্ব

সমাজসেবা ও সমাজজীবনে দেবোত্তর প্রথার অবদান বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। হিন্দু অধ্যুষিত ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষা, চিকিৎসা, উপাসনালয় এবং অসহায় দুঃস্থদের কল্যাণে প্রাচীনকাল হতে দেবোত্তর প্রথা' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দেবোত্তর সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা, অনাথ আশ্রম, মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ভারত এবং বাংলাদেশে ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় সাধন করে সমাজ সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও সমস্যা জর্জরিত দেশে ঐতিহ্যগত সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেবোত্তর প্রথার তাৎপর্য ও গুরুত্ব সমাজকল্যাণে আজও বিদ্যামান। এটি হিন্দু ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজসেবামূলক প্রথা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ০৯ বায়তুল মাল

টপিক ০৯: বায়তুল মাল

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বায়তুল মাল

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগার বায়তুল মাল হিসেবে পরিচিত। ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের সুসংগঠিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করছে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে প্রতিষ্ঠিত বায়তুল মাল। বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের সার্বিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসাবে স্বীকার করে নেয়া হয়।

বায়তুল মাল

বায়তুল মাল কী?

আরবী "বায়ত" শব্দের অর্থ 'ঘর' বা 'আগার' এবং 'মাল' শব্দের অর্থ সম্পদ। সুতরাং বায়তুল মালের শাব্দিক অর্থ হলো সম্পদাগার। সাধারণত রাষ্ট্রীয় কোষাগারকেই বায়তুল মাল বলা হয়। মূলত বায়তুল মাল বলতে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা সরকারি তহবিলকে বোঝায়। বায়তুল মাল ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনকল্যাণের লক্ষ্যে গঠিত একটি মৌলিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। জনকল্যাণ এবং ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য বায়তুল মাল গঠিত।

বায়তুল মাল

বায়তুল মাল এর পটভূমি

হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফত কালে সর্বপ্রথম বায়তুল মাল বাস্তব রূপ লাভ করলেও মদীনায় প্রথম যেদিন ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়, সেদিন হতেই বায়তুল মালের সূচনা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বায়তুল মালের কোনরূপ ধন সম্পদ সঞ্চিত রাখার অবকাশ ছিল না। কারণ তখন রাষ্ট্রের এবং সাধারণ নাগরিকদের প্রয়োজনের তুলনায় ধনসম্পদ অত্যন্ত নগণ্য ছিল বলে, সম্পদ হস্তগত হবার সঙ্গে সঙ্গে নবী করিম (স) অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। এ সম্পর্কে নবী করিম (স)-এর বাণী হচ্ছে- "আমি তোমাদিগকে দানও করি না, নিষেধও করি না, আমি তো বন্টনকারী মাত্র। আমাকে যেরূপ আদেশ করা হয়েছে, আমি সেভাবেই জাতীয় সম্পদ বন্টন করে থাকি।"

হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলেও জাতীয় প্রয়োজনের তীব্রতা হেতু বায়তুল মালে ধন-সম্পদ জমা হতো না। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের (রা) আমলে বায়তুল মালে প্রচুর সম্পদ জমা হতে থাকে। ফলে প্রদেশগুলোতে বায়তুল মাল স্থাপিত হয়। এ সময়ে বায়তুল মাল একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বায়তুল মালের আয়-ব্যয় ইসলামের বিধান মোতাবেক পরিচালিত।

বায়তুল মাল

বায়তুল মাল এর আয়ের উৎস

বায়তুল মালে যেসব খাত হতে সম্পদ জমা হতো সেগুলো হচ্ছে- মুসলমানদের ভূমি রাজস্ব ও খনিজ সম্পদের রয়ালটি; বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত ধনসম্পদ, গণিমাতের মাল, অমুসলিমদের অধিকারভুক্ত জমির খাজনা; দেশের সমষ্টিগত চাহিদা পূরণের জন্য আদায়কৃত চাঁদা বাবদ লব্ধ অর্থ; মালিক বা উত্তরাধিকারবিহীন ধনসম্পত্তি; অমুসলিম নাগরিকদের কাছ থেকে আদায়কৃত জিজিয়া কর ইত্যাদি।

বায়তুল মাল

বায়তুল মালের ভূমিকা

বায়তুল মাল রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সম্পত্তি। এতে সঞ্চিত সম্পদে ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত। এতে একজন অন্যজন অপেক্ষা অধিক অধিকার লাভের দাবী করতে পারে না। ইসলাম ধর্মের বিধানের আওতায় বায়তুল মালের ব্যয় বণ্টিত হতো। ইসলামী রাষ্ট্রের কোন একজন যাতে মৌলিক চাহিদা পূরণ হতে বঞ্চিত না হয়, তার ব্যবস্থা করা বায়তুল মালের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। বায়তুল মালের মাধ্যমেই জনগণের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। সরকারি কর্মচারিগণ নিজেদের চাকরির জামানতে বায়তুল মাল হতে বিনাসুদে ঋণ গ্রহণ করতে পারত। বস্তুত ঋণদান সমিতির ইতিহাসে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। জাকাতের অর্থে নির্দিষ্ট আট শ্রেণির জনগণের চাহিদা পূরণ না হলে, বায়তুল মাল হতে সাহায্য করা হতো। জনগণের নিজ নিজ প্রয়োজন পূরণের জন্য যেমন বিনাসুদে ভোগ্য ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হতো; তেমনি উৎপাদনকারী কার্যে বিনিয়োগের জন্য খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বায়তুল মাল হতে উৎপাদন ঋণ দেয়া হতো।

বায়তুল মাল

বায়তুল মালের ভূমিকা

পরিশেষে বলা যায়, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বায়তুল মাল একদিকে দুঃস্থ, অসহায়, অক্ষম দরিদ্রদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, অন্যদিকে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা দানের মাধ্যমে সবশ্রেণীর জনগণের কল্যাণ সাধনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বায়তুল মাল ব্যবস্থাই খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী রাষ্ট্রকে বিশ্বের প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করে।

বায়তুল মাল

বায়তুল মালের তাৎপর্য

সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে জনগণের কল্যাণ সাধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বায়তুল মাল। বিশ্বের দরিদ্র আইন এবং নিরাপত্তা কর্মসূচির পথ প্রদর্শক এবং ভিত্তি হিসেবে বায়তুল মালকে আখ্যায়িত করা যায়। বায়তুল মালের আদর্শ ও দর্শনের ভিত্তিতেই পৃথিবীর সবদেশে জণকল্যাণ বিভাগগুলো পুরোপুরি না হলেও আংশিকভাবে বায়তুল মাল ব্যবস্থার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশে দরিদ্র শ্রেণি, নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং ঋণ সমস্যা সমাধানে বায়তুল মাল ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশের ধর্মভীরু মুসলমানগণ প্রতি বছর সদকা, জাকাত, ফেতরা, দান, কোরবানীর চামড়া ইত্যাদি খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। এসব অর্থ সংগ্রহ করে বায়তুল মালের মতো তহবিল সৃষ্টি করা গেলে ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতা পুনর্বাসন, অক্ষম প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন ইত্যাদি সমস্যার সমাধান অনেকাংশে সম্ভব। বায়তুল মালের আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন সম্ভব। সুতরাং সমাজকল্যাণ প্রথা হিসেবে বায়তুল মালের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ১০ এতিমখানা

টপিক ১০: এতিমখানা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

এতিমখানা

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে অসহায় পরিত্যক্ত এতিম শিশু-কিশোরদের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে এতিমখানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিশ্বের সব দেশেই প্রাচীনকাল হতে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের সম্পদশালী শ্রেণি ও ধর্মপ্রাণ মনীষীগণ এতিমখানা বা অনাথ আশ্রম পরিচালনা করে আসছেন। এতিমখানা হলো শিশুকল্যাণে নিয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

এতিমখানা

এতিমখানা কী?

এতিমখানা এমন একটি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান যেখানে এতিম পরিত্যক্ত অনাথ শিশু-কিশোরদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হয়। সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসেবে এতিম-অনাথ শিশুদের গড়ে উঠতে এতিমখানা সাহায্য করে। শিশুকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এতিমখানার উদ্দেশ্যগুলো হলো-

এতিম অসহায় শিশুদের নিরাপদ আশ্রয় ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা।

শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করা, যাতে এতিম শিশুরা সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হয়।

অনাথ শিশু-কিশোরদের সামাজিক পরিবেশে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

এতিমখানা

এতিমখানার গুরুত্ব

এতিম, অসহায়, পরিত্যক্ত শিশু-কিশোররা সমাজের মানুষ। প্রতিকূল অবস্থার শিকার হয়ে তারা স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সুতরাং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালন সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে সব সমাজেই স্বীকৃত। বিশ্বের প্রতিটি ধর্মেই অসহায় এতিমদের লালন-পালনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে এতিমদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সামাজিক এবং ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের তাগিদে বিশ্বের সবদেশে এতিমখানা বা অনাথ আশ্রম সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

এতিমখানা

এতিমখানার গুরুত্ব

বাংলাদেশে ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বন্ধু এতিমখানা বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত হচ্ছে। ইসলাম ধর্মের প্রচারকদের পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর লক্ষ্যে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট বহু এতিমখানা পরিচালিত হচ্ছে। এতিম ও পরিত্যক্ত শিশুদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি পর্যায়ে এতিমখানা প্রতিষ্ঠা এবং বেসরকারি এতিমখানাগুলোকে সরকারি অনুদান দিয়ে সহযোগিতা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে সরকারি এতিমখানাগুলো শিশু পরিবার এবং বেবী হোম নামে পরিচিত। স্বাধীনতার পরপর প্রচলিত সরকারি এতিমখানা, দুঃস্থ মহিলা ও শিশুসেবা যত্ন কেন্দ্রগুলো সমন্বয় করে শিশুসদন নাম দেয়া হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে (১৯৯০-১০০৫) সরকারি শিশু সদনে পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এগুলোকে শিশু পরিবারে রূপান্তর শুরু হয়। বর্তমানে সরকারি এতিমখানাগুলো শিশু পরিবার নামে পরিচিত। এসব শিশু পরিবারে একজন বড় আপা এবং বড় ভাইয়ার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে বিশ হতে পঁচিশজন এতিম পারিবারিক পরিবেশে প্রতিপালিত হচ্ছে।

এতিমখানা

এতিমখানার গুরুত্ব

শিশু পরিবারে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের বেবীহোমে রেখে লালন-পালন করা হয় এবং পাঁচ বছর পূর্ণ হলে তাদের শিশু পরিবারে স্থানান্তর করা হয়। বাংলাদেশে সরকারি শিশু পরিবার ৮৫টি, বেবী হোম ৬ টি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এতিমখানা সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তিন হাজারের অধিক এবং অনুমোদিত আসন সংখ্যা ছিল ৪৩,৩৮৩ জনের। সরকারি এতিমখানাগুলোতে ১০,৩৭৫ জন এতিম শিশুদের লালন করা হচ্ছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার যৌথ প্রচেষ্টায় এতিম শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ তথা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

এতিমখানা

এতিমখানার গুরুত্ব

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী সাহায্য সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বেসরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো অনাথ আশ্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব আশ্রমে পারিবারিক পরিবেশে এতিমদের লালন-পালন এবং শিক্ষাদানের ব্যাবস্থা করা হয়। যেমন- এসওএস (SOS) সাহায্য সংস্থা অনাথ শিশুদের জন্য পরিচালিত ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা এবং চট্টগ্রামের 'শিশুপল্লী'। বর্তমানে এতিমখানাগুলোর লক্ষণীয় দিক হচ্ছে এতিমখানায় এতিমদের পুনর্বাসনের জন্য শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও অনুন্নত দেশে এতিমখানাই হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যা এতিম, পরিত্যক্ত এবং অনাথ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ১১ সমাজসেবা ও সমাজকর্ম

টপিক ১১: সমাজসেবা ও সমাজকর্ম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজসেবা ও সমাজকর্ম

সমাজকল্যাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়গুলোর মধ্যে সমাজসেবা অন্যতম। অনেক সময় সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবাকে অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। যদিও উভয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। প্রাক-শিল্প যুগে সমাজসেবাকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হত। তখন আর্ত-মানবতার সেবায় পরিচালিত যে কোন কার্যক্রমকেই সমাজসেবা হিসেবে বুঝানো হত। বর্তমানে সমাজসেবামূলক খাতে ব্যয়কে মানব মূলধন বিনিয়োগ হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। মনীষী জেমস মিলের ভাষায়, সমাজসেবা খাতে ব্যয় করাকে বর্তমানে মানব মূলধনে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। (Social service expenditures are now widely regarded as investments in human capital.)**

সমাজসেবা ও সমাজকর্ম

সমাজসেবার সংজ্ঞা

অক্সফোর্ড অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী, "সমাজসেবা বলতে জনসমষ্টিকে সরকার প্রদত্ত সুসংগঠিত সেবা বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং গৃহায়নে সরকার প্রদত্ত সুসংগঠিত সাহায্য ও পরামর্শ সেবাকে বুঝায়।" (Organized government service providing help and advice to the community especially health, education and housing.)
অন্যদিকে জেরি এবং জেরি সম্পাদিত কলিন্স সমাজবিজ্ঞান অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী, "সমাজসেবা হলো রাষ্ট্র প্রদত্ত যেকোন ধরনের সেবা, যা সব মানুষের জীবনমান উন্নয়নে নিবেদিত।" (Social services are any state provided services, which have a bearing on the quality of life of all people.)
সনাতন এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ হতে সমাজের অসুবিধাগ্রস্ত, দুঃস্থ, অসহায় শ্রেণির কল্যাণে গৃহীত যাবতীয় কার্যাবলিকেই সমাজসেবা বলা হয়। কিন্তু আধুনিক ধারণা মতে সমাজসেবা হলো মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠিত কার্যক্রমের সমষ্টি। বর্তমানে সমাজসেবাকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সমাজসেবা ও সমাজকর্ম

সমাজসেবার সংজ্ঞা

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞানুযায়ী, "সমাজসেবা হলো সমাজকর্মী এবং অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিদের পরিচালিত সুসংগঠিত কার্যক্রম, যা মানুষের কল্যাণ ও স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে নিয়োজিত। এসব কার্যক্রম মানুষকে অধিক স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে; পরনির্ভরশীলতা প্রতিরোধ করে, পারিবারিক সম্পর্ক শক্তিশালী এবং ব্যক্তি, পরিবার, দল বা জনসমষ্টির সদস্যদের সফল সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে।"

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (ECOSOC) সংজ্ঞানুযায়ী, "ব্যক্তি এবং তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সাহায্য করার লক্ষ্যে সংগঠিত কার্যক্রমের সমষ্টিই হলো সমাজসেবা।"

সমাজবিজ্ঞানী হ্যারী এম ক্যাসিডি (Harry M Cassidy)-এর মতে, সমাজসেবা বলতে সেসব সংগঠিত কার্যাবলির সমষ্টিকে বুঝায়, যেগুলো প্রাথমিক এবং প্রত্যক্ষভাবে মানব সম্পদ উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং প্রতিরোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সমাজসেবা ও সমাজকর্ম

সমাজসেবার সংজ্ঞা

হ্যারী এম ক্যাসিডি যেসব কর্মসূচিকে সমাজসেবার পরিধিভুক্ত বলেছেন, সেগুলো হলো সামাজিক সাহায্য (Social Assistance); সামাজিক বীমা (Social Insurance); শিশু কল্যাণ (Child Welfare); সংশোধনমূলক কার্যক্রম (Corrections); মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Hygiene); জনস্বাস্থ্য (Public Health); শিক্ষা (Education); চিত্তবিনোদন (Recreation); শ্রমিক সংরক্ষণ (Labour Protection) এবং গৃহসংস্থান (Housing)।

আধুনিক দৃষ্টিকোণ হতে সমাজসেবা হলো, রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত সে সব সংগঠিত কার্যক্রমের সমষ্টি, যেগুলো মানব সম্পদ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত। মানুষের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ এবং পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে মানুষকে সহায়তা করা সমাজসেবার লক্ষ্য।

সমাজসেবা ও সমাজকর্ম

সমাজসেবা কর্মসূচির শ্রেণিবিভাগ

সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা এবং সামাজিক ভূমিকা পালনের সামর্থ্য শক্তিশালীকরণে সাহায্য করার লক্ষ্যে সমাজসেবা কর্মসূচি পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হয়। উদ্দেশ্য এবং প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ হতে সমাজসেবা কর্মসূচিগুলোকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

সামাজিকীকরণ এবং মানব বিকাশের জন্য গৃহীত সমাজসেবা কর্মসূচি (Social services for socialization and development) : এ ধরনের সমাজসেবা কর্মসূচিগুলো শিশু ও কিশোর, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, অক্ষম ইত্যাদি শ্রেণির জনগোষ্ঠীর সামাজিকীকরণ ও বিকাশে সাহায্য করে। পরিবার কল্যাণ, শিশু কল্যাণ, যুবকল্যাণ, দিবাযত্ন কেন্দ্র ইত্যাদি এ শ্রেণীর সমাজসেবা কর্মসূচি।

প্রতিকার, সাহায্য, পুনর্বাসন এবং সামাজিক প্রতিরক্ষণের জন্য গৃহীত সমাজসেবা কর্মসূচি (Social services for therapy, help, rehabilitation and social protection) : বিভিন্ন শ্রেণির এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সমাজসেবা কর্মসূচি এর পরিধিভুক্ত। এ ধরনের সমাজসেবা কর্মসূচি দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী উভয় ধরনের হয়। পারিবারিক সেবা প্রতিষ্ঠান, মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রবেশন ও প্যারোল কার্যক্রম, প্রবীণ সেবা প্রতিষ্ঠান এ ধরনের সমাজসেবা কর্মসূচির উদাহরণ।

সমাজসেবা ও সমাজকর্ম

সমাজসেবা ও সমাজকর্ম

পেশাদার সমাজকর্মের মূল বিষয় হলো সমাজসেবা। সমাজসেবা সমাজকর্মের অন্যতম মূল্যবোধ। সমাজকর্মীদের প্রধান ভূমিকা প্রয়োজনের সময় মানুষকে সাহায্য প্রদান এবং সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান। সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, বর্ণভেদে সেবা প্রদান সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র (Practice Field) হলো সমাজসেবা কর্মসূচি। প্রত্যেক সমাজেই প্রবীণ, শিশু, নারী, সংখ্যালঘু, অভিবাসী প্রভৃতি বিশেষ শ্রেণির (Special population) জনগোষ্ঠী রয়েছে। পেশাদার সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো মানবোপযোগী সেবা প্রদানের (Humanize services) মাধ্যমে সমাজের বিশেষ শ্রেণির জনগোষ্ঠীর জীবন মানোন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রবীণ, শিশু, নারী, সংখ্যালঘু প্রভৃতি বিশেষ শ্রেণির জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কতগুলো বিশেষ চাহিদা পূরন করতে হয়। কারণ জীবন চক্রের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই এসব জনগোষ্ঠীর বিশেষ ধরনের চাহিদা ও প্রয়োজন দেখা দেয়। সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে সমাজসেবা কার্যক্রমকে অধিক কার্যকর করে তোলা যায়।

সমাজসেবা ও সমাজকর্ম

সমাজসেবা ও সমাজকর্ম

সমাজকর্ম ও সমাজসেবার মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সমাজকর্ম একটি পেশা এবং ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। অন্যদিকে, সমাজসেবা হলো কতগুলো সুসংগঠিত কার্যক্রম। যেগুলো বাস্তবায়নে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলন করা হয়। সমাজসেবা হলো লক্ষ্য আর সমাজকর্ম হলো লক্ষ্যার্জনের অন্যতম উপায়। লক্ষ্য এবং উপায় (Goals and Means) পরস্পর সম্পর্কিত হলেও এক নয়। সমাজকর্মের বিশেষ ধারা (Dimension) হলো সমাজসেবা।

সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগলাভ করে সমাজকর্মীরা সমাজকর্ম পেশা অনুশীলন করছে। দরিদ্র, বিকলাঙ্গ, মানসিক রোগী, কারাগার ও দরিদ্রাগারের বাসিন্দাদের জীবন মানোন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজকর্মের সেবামূলক ধারার সূচনা হয়। বর্তমান শিশুকল্যাণ, কিশোর অপরাধীদের আটক নিবাস, প্রবীণ নিবাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রদত্ত মানবোপযোগী সেবা সমাজকর্মের সেবামূলক দিকের উদাহরণ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ১২ সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্ম

টপিক ১২: সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্ম

This Topic is important for

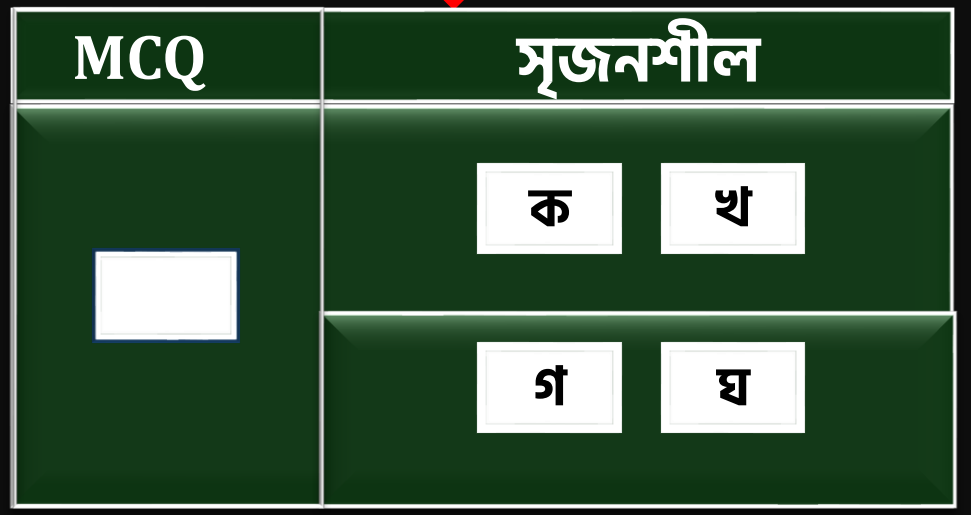

সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্ম

আধুনিক সমাজে জীবনের সাধারণ ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবনযাপনের সাধারণ ঝুঁকির মধ্যে আকস্মিক অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রতিবন্ধী, বেকারত্ব, বার্ধক্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমাজের প্রতিটি সদস্যকেই কোন না কোন সময়ে আকস্মিকভাবে এসব ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। যার ফলে প্রতিনিয়ত মানুষ অক্ষম, বিকলাঙ্গ, কর্মহীন ও অকাল মৃত্যু বরণ করে নিজেকে এবং পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এসব আকস্মিক আর্থিক বিপর্যয় মোকাবেলা করে জীবন ধারণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যেই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রবর্তন করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্ম

সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা

আধুনিক শিল্প সমাজের অসুস্থতা, বেকারত্ব, বার্ধক্যজনিত নির্ভরশীলতা, পেশাগত দুর্ঘটনা, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বহির্ভূত আকস্মিক আর্থিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সামাজিক প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচিই সামাজিক নিরাপত্তা। সমাজিক নিরাপত্তা হলো রাষ্ট্র প্রদত্ত আয়ের একটি ব্যবস্থা, যা আর্থিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে।

ম্যরিস স্ট্যাক্ (Maurice Stack) তাঁর "The Meaning of Social Security" গ্রন্থে সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞায় বলেছেন, "আধুনিক জীবনের অসুস্থতা, বেকারত্ব, প্রবীণ বয়সের নির্ভরশীলতা, শিল্প দুর্ঘটনা ও প্রতিবন্ধীতার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি যখন স্বীয় ক্ষমতা এবং দূরদৃষ্টির দ্বারা নিজেকে ও পরিবারকে রক্ষা করতে অক্ষম হয় তখন সমাজ প্রদত্ত প্রতিরক্ষামূলক যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, সেসব কর্মসূচিই সামাজিক নিরাপত্তা। ২৫

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) সংজ্ঞানুযায়ী, "সামাজিক নিরাপত্তা এমন একটি নিশ্চয়তা, যা মানুষকে আকস্মিক বিপদের সময় যথাযথ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেয়া হয়। এসব বিপদ বা বিপর্যয় এমনই আকস্মিক যে, স্বল্প আয়ের মানুষ স্বীয় সামর্থ্য ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে এককভাবে অথবা সহযোগীদের সাহায্যে মোকাবিলা করতে পারে না।"

সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্ম

সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা

ব্যাপক দৃষ্টিকোণ হতে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাখ্যা দিয়ে ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তার প্রবর্তক উইলিয়াম বিভারিজ (William Beveridge)-বলেছেন, "সামাজিক নিরাপত্তা হলো অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, অপরিচ্ছন্নতা এবং অসুস্থতা" -মানবকল্যাণের পথে বিদ্যমান এ পাঁচটি দৈত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।" (Social Security is an attack on five giants namely Want, Disease Ignorance, Squalor and Illness.)

অভাবের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা (Security against want)-এর অর্থ হলো সমাজে প্রত্যেক মানুষের নিজ শ্রমের বা সেবার বিনিময়ে যৌক্তিক সম্মানী বা পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার রয়েছে, যার দ্বারা সে ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখতে এবং নির্ভরশীলদের ভরণপোষণ করতে পারে। সমাজের সকল সদস্যের জন্য শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হলো অজ্ঞতার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা। মারাত্মক দূষিত ও আবর্জনাপূর্ণ পরিবেশের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার অর্থ হলো অপরিকল্পিত ও অসংগঠিতভাবে গড়ে উঠা শহরায়নের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্ম

সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা

আধুনিক শিল্প-সমাজে জীবনের সাধারণ ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক জীবন যাপনের সাধারণ ঝুঁকির মধ্যে অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রতিবন্ধীত্ব, বেকারত্ব, বার্ধক্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমাজের প্রতিটি সদস্যকেই কোন না কোন সময়ে আকস্মিকভাবে এসব ঝুঁকির সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রতিনিয়ত মানুষ অক্ষম, কর্মহীন ও অকাল মৃত্যু বরণ করছে। এসব আকস্মিক ও শোচনীয় অবস্থাকে মোকাবেলা করে, জীবনধারণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যেই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রবর্তন করা হয়েছে।

মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিক নিরাপত্তা শুধু ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের উপায় নয়, এটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কার্যকর হাতিয়ার এবং অন্যতম পূর্বশর্তও।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্ম

সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ

সামাজিক নিরাপত্তা সাধারণত সামাজিক বীমা এবং সামাজিক সাহায্য এ দু'ধরনের হয়। বর্তমানে সমাজসেবাকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয়।

সামাজিক বীমা (Social Insurance) : সামাজিক বীমা হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সে দিক, যাতে কোন ব্যক্তি স্বীয় সামর্থ্য ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে নিজেকে ও তার পরিবারকে ভবিষ্যত আর্থিক বিপর্যয়ের প্রাক্কালে আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, "সামাজিক বীমা হলো সংবিধিবদ্ধ শর্তাধীন ঝুঁকি যেমন- বৃদ্ধ বয়স, অক্ষমতা, উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু, বেকারত্ব, পেশা বা সংশ্লিষ্ট আঘাত এবং রোগের বিরুদ্ধে নাগরিকদের সংরক্ষণের সরকারি কর্মসূচি।" যেমন- শিল্প দুর্ঘটনা বীমা, স্বাস্থ্য বীমা, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, যৌথ বীমা ইত্যাদি। সাধারণত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে এরূপ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়।

সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ

সামাজিক বীমার প্রধান শর্ত বাধ্যতামূলক চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ (Compulsory contributions and participation)। এজন্য সামাজিক বীমাকে Contributory social security system বলা হয়। সামাজিক বীমা কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধা প্রাপ্তির নিয়মনীতি ও শর্তাদি সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত (Clearly defined benefit formulas) করা থাকে। সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনরকম অস্পষ্টতা ও জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। সামাজিক বীমা বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা অনুমোদিত আইনের আওতায় রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে সামাজিক বীমা পরিচালিত।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্ম

সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ

সামাজিক সাহায্য (Social Assistance): যেসব শ্রেণির লোক সামাজিক বীমার পরিধিভুক্ত নয়, সেসব শ্রেণির লোকদের সাহায্য করার বিশেষ ব্যবস্থা হলো সামাজিক সাহায্য। সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী, "সামাজিক সাহায্য প্রদান ব্যবস্থার মাধ্যমে সেসব লোকদের সাহায্য করা হয়, যাদের নিজেদের রক্ষা করার মতো অন্যকোন উপায় নেই।" সামাজিক সাহায্যের অর্থের যোগান সরকারের রাজস্বখাত থেকে সংস্থান করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অকস্মাৎ সৃষ্ট আর্থিক বিপর্যয়ের প্রাক্কালে সরকারি উদ্যোগে গৃহীত সাহায্যাবলী সামাজিক সাহায্য। স্বাভাবিক সময়ে দুঃস্থ, দরিদ্র ও অক্ষমদের এ ব্যবস্থার অধীনে সাহায্য করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে সামাজিক সাহায্য হিসেবে বয়স্কভাতা, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মবেষ্টনী কর্মসূচি বাস্ত-বায়ন করছে। সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে এসব কার্যক্রম বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্ম

সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্ম

সামাজিক নিরাপত্তার সঙ্গে সমাজকর্মের প্রায়োগিক সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম। ইংল্যান্ড, আমেরিকাসহ ইউরোপের উন্নত দেশগুলোতে নিরাপত্তা কর্মসূচি সর্বজনীন সমাজসেবা (Universal Social Services) কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। বাঞ্ছিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থেই সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব অপরিসীম। জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণায়ও সামাজিক নিরাপত্তাকে সর্বজনীন মানবিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্ম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সমাজকর্মের উদ্দেশ্য হলো মানুষের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ এবং সামাজিক ভূমিকা পালনের সামর্থ্য জোরদারকরণে সাহায্য করা। সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না থাকলে সুপ্ত প্রতিভা ও সামর্থ্য বিকাশের প্রয়োজনীয় মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের সুযোগের অভাব দেখা দেয়। সমাজকর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যার্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সামাজিক নিরাপত্তা।তর অর

সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্ম

সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্ম

সমাজকর্ম অনুশীলনের মৌলিক' উদ্দেশ্য হলো সমাজে বিরাজমান সম্পদ ব্যবস্থার (Resource system) কার্যকারিতা জোরদার এবং সেগুলোর সঙ্গে মানুষের সংযোগ বৃদ্ধিকরণ। সামাজিক সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট নীতি ও আইন প্রণয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সরবরাহ এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তাবায়নজনিত সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের যোগাযোগ স্থাপনে সমাজকর্মীরা সাহায্য করতে পারেন। অনেক সময় সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সম্পর্কে অজ্ঞতা বা যথাযথ তথ্যের অভাবে সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করতে পারে। অন্যদিকে, প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং যুক্তি উপস্থাপনের (Advocacy) মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে সহজীকরণ ও গণমুখী কার্যক্রমে পরিণত করতে পারেন।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্ম

সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্ম

সামাজিক নিরাপত্তা এবং সমাজকর্ম সম্পর্কযুক্ত হলেও উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সমাজকর্ম একাধারে ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান এবং সাহায্যকারি পেশা। অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা হতো একটা অর্থনৈতিক কর্মসূচি। যার মাধ্যমে আকস্মিক আর্থিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করা হয়। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ১৩ সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকর্ম

টপিক ১৩: সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকর্ম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকর্ম

সামাজিক পরিবর্তন পেশাদার সমাজকর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণাগুলোর মধ্যে অন্যতম। কারণ পরিবর্তন ছাড়া সমাজের উন্নয়ন আশা করা যায় না। সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং পরিবর্তনশীলতা সমাজের সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ এক স্তর হতে অন্য স্তরে উপনীত হচ্ছে। সমাজকর্ম হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন প্রত্যয়টি অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত।

সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকর্ম

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা

নৃবিজ্ঞানীগণ আদিম সমাজ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'পরিবর্তন' ধারণাটিকে ‘‘সংশোধন’’ অর্থে ব্যবহার করতেন। তারা সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার সংশোধনের মাধ্যমে সমাজ যে নতুন রূপ লাভ করত, তাকেই সামাজিক পরিবর্তন বলে চিহ্নিত করতেন। পরবর্তীতে সংশোধনের ফলে সমাজে যে পরিবর্তন, বিবর্তন এবং উন্নতি হয় তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠলে সামাজিক রূপান্তরকে পরিবর্তন বলে চিহ্নিত করা হয়। একটি বিশেষ সামাজিক রূপ থেকে অন্যরূপ ধারণ করাকেই সামাজিক পরিবর্তন বলা হয়। সমাজকাঠামোর রূপান্তরই সামাজিক পরিবর্তন।

সামাজিক পরিবর্তন পরিভাষাটি মানুষের মিথস্ক্রিয়া এবং আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে সংঘটিত পরিবর্তনকে নির্দেশ করতে ব্যবহার করা হয়। সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের প্রবাহ। সুতরাং সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক সম্পর্ক ব্যবস্থার মধ্যে সাধিত পরিবর্তনকে (A change in the system of social relationships) বুঝায়।

সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকর্ম

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা

মনীষী রবার্ট এল বার্কার সম্পাদিত সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, "সামাজিক পরিবর্তন হলো সময়ের ব্যবধানে কোন সমাজের বিধি-বিধান, আদর্শ, মূল্যবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন" (Social change is variations over time in a society's laws, norms, values and institutional arrangements.) ।

সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকর্ম

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা

অধ্যাপক মরিস জিন্সবার্গ (Prof. Morris Ginsberg) এর মতে, "সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজকাঠামোর পরিবর্তন অর্থাৎ সমাজের আকার, সমাজের বিভিন্ন অংশের গড়ন ও ভারসাম্য অথবা সমাজের সাংগঠনিক রূপের পরিবর্তনকে বুঝায়। তদুপরি সামাজিক পরিবর্তন দ্বারা মনোভাব (Attitude), মূল্যবোধ বা' সামাজিক বিধি যেগুলো সমাজকাঠামোকে সংহত রাখতে সহায়তা করে সেগুলোর পরিবর্তনকে বুঝায়।"

জিন্সবার্গের সংজ্ঞানুযায়ী সামাজিক পরিবর্তন বলতে বুঝায় সমাজকাঠামো এবং তৎসম্পর্কিত কার্যাবলির পরিবর্তন এবং যেসব আদর্শ, মূল্যবোধ বা সামাজিক বিধি-বিধান সমাজকাঠামোকে সংহত এবং এর বিভিন্ন অংশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে সেগুলোর পরিবর্তন। সমাজবিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিস-এর মতে, "সামাজিক পরিবর্তন বলতে কেবল সমাজের সাংগঠনিক কাঠামোর পরিবর্তনকেই বুঝায়। অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তন বলতে শুধু সমাজকাঠামো এবং তৎসম্পর্কিত কার্যাবলির পরিবর্তনকে বুঝায়।

সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকর্ম

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

সামাজিক পরিবর্তন একটি জটিল প্রক্রিয়া। বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে এবং বিভিন্ন কারণে সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জৈবিক দৃষ্টিকোণ হতে সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। কোন নির্দিষ্ট এলাকার আবহাওয়া, জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে, সে এলাকার জনগণের সার্বিক জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। যার প্রভাবে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রভাবে মানুষের ধ্যান-ধারণা ও মানসিকতার যে পরিবর্তন ঘটে তা সামাজিক পরিবর্তনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকর্ম

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

মানুষের বিভিন্ন জৈবিক প্রয়োজন চরিতার্থ করাই সামাজিক আচার-ব্যবস্থা, প্রথা-প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। মানুষের মৌল ও গৌণ প্রয়োজনের পরিবর্তন ঘটলে সংশ্লিষ্ট আচার-ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। আবার মানুষের প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হলেও প্রচলিত আচার-ব্যবস্থাগুলোর পরিবর্তন সাধন করা হয়।

অন্যদিকে, যখন প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় উদ্ভাবিত পদ্ধতি মানুষের প্রয়োজন পূরণের অধিক সহায়ক হয়, তখন মানুষ পুরাতন পদ্ধতি ত্যাগ করে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করে। ফলে সামাজিক আচার-ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং দেখা যায় মানুষের জৈবিক তথা মৌল ও গৌণ প্রয়োজন পূরণের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত।

সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকর্ম

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও কলাকৌশলগত উন্নয়ন সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে।

যেমন- শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে যে শিল্পায়ন ও নগরায়ন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়, তার প্রভাবে প্রাক-শিল্প যুগের সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। যুগে যুগে মানুষের চিন্তা-চেতনা, দর্শন, আবিষ্কার সমাজ জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে।

কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে সমাজের মানুষের মধ্যে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠলে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। কারণ অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষ প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট হয়, যা সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে। জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, গঠন, কাঠামো প্রভৃতি পরিবর্তন সমাজের বিভিন্ন প্রথাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে

পরিবর্তন সাধন করে। যে কোন সমাজের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা একটি বিশেষ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান।

সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকর্ম

সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকর্ম

সমাজকর্ম অনুশীলনের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। সমাজকর্মের' হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ার লক্ষ্যই হলো সমাজব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন। পরিবর্তন ছাড়া সমাজকর্মের উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব নয়।' সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো সমাজের সকল মানুষের কল্যাণকে শক্তিশালীকরণে সামাজিক পরিবর্তন আনয়নকে প্রভাবিত করা। কারণ সামাজিক পরিবর্তন সবসময় মঙ্গলজনক নয়। পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মানুষ যখন সামঞ্জস্য বিধানে অক্ষম হয়, তখন বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসব সমস্যা মোকাবেলায় সাহায্য করে সমাজকর্ম।

সামাজিক পরিবর্তন সাধারণত পরিকল্পিত এবং অপরিকল্পিত এ দু'ধরনের হয়। পরিকল্পিত পরিবর্তন প্রত্যাশিত এবং পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিকল্পনা মাফিক করা হয়। লিপিট ওয়াটসন (Lippit Watson)-এর মতে, “পরিকল্পিত পরিবর্তন বলতে সে পরিবর্তনকে বুঝায়, যা ব্যক্তিত্বের গঠন কাঠামো বা সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পেশাগত নির্দেশনা ও পরিচালনার মাধ্যমে অর্জিত হয়।"

সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকর্ম

সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকর্ম

পরিকল্পিত পরিবর্তন সবসময় উদ্দেশ্যমূলক এবং পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠিত হয়। এরূপ পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষ সহজে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম হয়। ফলে পরিবর্তনজনিত কারণে সমাজে তেমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় না। সমাজ বহির্ভূত আকস্মিক কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অপরিকল্পিত পরিবর্তনের সূচনা হয়। অপরিকল্পিত পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মানুষ সহজে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না। অনেক সময় সমাজের বস্তুগত এবং অবস্তুগত দিকের পরিবর্তনের মধ্যে (Material and nonmaterial) অসঙ্গতি দেখা দিলে সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকর্ম

সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকর্ম

পেশাদার সমাজকর্মের লক্ষ্য হচ্ছে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনায়ন এবং পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে মানুষকে সহায়তা করা। যে কোন সামাজিক সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পরিবর্তনশীল মানব সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানুষের সামঞ্জস্য বিধানের অক্ষমতা। সমাজকর্ম পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানুষকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তুলতে সাহায্য করে। সমাজ উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে সমাজকর্ম মানুষকে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নে সচেতন করে তুলে। এক্ষেত্রে পেশাদার সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন (Community Development) এবং সামাজিক কার্যক্রম (Social Action) সামাজিক নীতি এবং সামাজিক পরিকল্পনা ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলো প্রয়োগ করা হয়।

সমাজকর্ম পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নে যেমন সচেষ্ট তেমনি অপরিকল্পিত পরিবর্তন প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। মানুষ ও পরিবেশের পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বয় সাধনে সাহায্য করে সমাজকর্ম। সুতরাং বলা যায়, সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকর্ম অনুশীলন অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ১৪ সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজকর্ম

টপিক ১৪: সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজকর্ম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজকর্ম

যে কোন দেশের জাতীয় উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন। সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন। সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজকর্ম

সামাজিক উন্নয়ন ধারণা

সামাজিক উন্নয়ন বলতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রার মানের অবস্থান, মানব সম্পদের বিকাশ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবেশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্বাবস্থা হতে অপেক্ষাকৃত উন্নততর অবস্থায় পরিবর্তনকে বুঝায়। সমাজের এক অবস্থা হতে অপেক্ষাকৃত উন্নততর এবং সমাজকাঠামোর প্রত্যাশিত পরিবর্তনকে সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক উন্নয়ন বলে আখ্যায়িত করেছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনমান, আয়ুষ্কাল, মানব সম্পদ, পরিবেশ ইত্যাদি খাতে একটা দেশ উন্নয়নের কোন স্তরে অবস্থান করছে, তার চিত্র সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

মনীষী জেমস মিজলে (James Midgley) সামাজিক উন্নয়নকে পরিকল্পিত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁর মতে, "সামাজিক উন্নয়ন হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমগ্র জনগোষ্ঠীর মঙ্গলজনক অবস্থা উন্নয়নে পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন প্রক্রিয়া।" (Social development is a process of planned social change designed to promote the well-being of the population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic development.)।

সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজকর্ম

সামাজিক উন্নয়ন ধারণা

মনীষী আর পাণ্ডে (R Panday)-র মতে, সামাজিক উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত হলো জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সম্পদের সুষম বন্টন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যাপকহারে জনগণের অংশগ্রহণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মূল উন্নয়ন ধারায় সম্পৃক্ত হবার সামর্থ্য অর্জনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

মনীষী জেএফ প্যাইভা (JF Paiva)-র মতে, "সামাজিক উন্নয়নের পরস্পর সম্পর্কিত দু'টি ধারার একটি হলো জনগণের নিজেদের ও সমাজের কল্যাণে ধারাবাহিক কাজ করার সামর্থ্যের উন্নয়ন এবং অন্যটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন, যাতে সকল পর্যায়ের জনগণের মৌল চাহিদা পূরণ হয়।" দু'টি সমাজের তুলনামূলক অবস্থান তুলে ধরার জন্য 'সামাজিক উন্নয়ন' ধারণাটি ব্যবহৃত হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনমান, আয়ুষ্কাল, মানব সম্পদ, পরিবেশ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে একটি দেশ উন্নয়নের কোন স্তরে অবস্থান করছে, তার চিত্র সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজকর্ম

সামাজিক উন্নয়ন ধারণা

সামাজিক উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যগুলো হলো- জাতীয় আয়ের সুষম কটনের মাধ্যমে সমগ্র জনগোষ্ঠীর মানবিক চাহিদা পূরণের সুযোগ সৃষ্টি করা; দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো অর্থাৎ রাস্তা-ঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং আইন ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা। বিভিন্ন পেশাজীবী ও শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং যেসব মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে, সেগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন।

সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজকর্ম

সমাজকর্ম ও সামাজিক উন্নয়ন

পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনে নতুন ক্ষেত্র (Field) হলো সামাজিক উন্নয়ন, যার লক্ষ্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে উন্নত সমাজ গঠনে মানুষকে সক্ষম করে তোলা। কারণ সামাজিক উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন কল্যাণধর্মী হয় না। সামাজিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকগুলোকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে, সমাজকর্মীরা সেগুলোর মোকাবেলা করতে প্রচেষ্টা চালায়। সামাজিক উন্নয়ন প্রত্যয়টি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা সমাজের বিভিন্ন অংশের অসম পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। ফলে তারা স্বল্পোন্নত এলাকার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য করতে পারে।

সমাজকর্মের লক্ষ্য মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালনের সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং পরিকল্পিত পরিবর্তনের মাধ্যমে উন্নত সমাজ গঠনে মানুষকে সহায়তা করা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, সম্পদের সুষম বণ্টন, সামাজিক নীতি, সামাজিক পরিকল্পনা প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে সমাজকর্ম জ্ঞান, দক্ষতা প্রয়োগ করা যায়।

সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজকর্ম

সমাজকর্ম ও সামাজিক উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য। মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ব্যবস্থা, আইন ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। যেসব সামাজিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে সেগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন সামাজিক উন্নয়নের পরিধিভুক্ত। আর এ সবগুলো কার্যক্রমে পেশাদার সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো বাস্তবসম্মত সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনা। সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য সামাজিক নীতি পরিবর্তন ও উন্নয়ন। সামাজিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সামাজিক নীতির তথ্য বিশ্লেষণ, নীতির স্বপক্ষে জনমত গঠন, নীতি নির্ধারকদের প্রভাবিতকরণ, খসড়া নীতি প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সমাজকর্ম অনুশীলনের নতুন ধারা (New dimension) হলো লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, যা সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সমাজকর্মের পদ্ধতি সমষ্টি সমাজকর্ম এবং সামাজিক কার্যক্রম সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই প্রয়োগ করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ১৫ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজকর্ম

টপিক ১৫: সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজকর্ম

মানুষ সামাজিক জীব এবং মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে সমাজের সৃষ্টি। আবার সামাজিক মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের স্বার্থেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। সুশৃঙ্খল সমাজ জীবন তখনই সম্ভব যখন সমাজে এমন একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সক্রিয় থাকে, যার সাহায্যে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয়। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে সমাজ অনুমোদিত ও প্রত্যাশিত পথে পরিচালিত করার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় সমাজিক নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যক্তিকে সামাজিকীকরণ শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তার ব্যবহারিক জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজকর্ম

সামাজিক নিয়ন্ত্রনের সংজ্ঞা

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কতগুলো শক্তি ও মূল্যবোধের সমষ্টিকে বোঝায়, যার সাহায্যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি এবং যাতে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও কলহ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর শৃঙ্খলা এবং কল্যাণের পরিপন্থি না হয়। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, "সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হলো সামাজিক শৃংখলার বজায় এবং সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গৃহীত কোন সমাজের বা সমাজের কতিপয় লোকের সুসংগঠিত কার্যক্রম।"

সমাজকর্ম অভিধানের দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, "সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হলো সমাজের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ও বিধিবিধানের প্রতি 'প্রয়োজনীয় আনুগত্য প্রদর্শনে মানুষকে বাধ্য করা।" (Social control is the efforts to constrain people, requiring, them to adhere to established norms and laws.)

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজকর্ম

সামাজিক নিয়ন্ত্রনের সংজ্ঞা

অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ (MacIver and Page) এর মতে, "সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে এমন একটি উপায়কে বোঝায়, যার মাধ্যমে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, সামঞ্জস্য বজায় রাখে এবং সামগ্রিকভাবে একটি পরিবর্তনশীল ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শুধু সমাজে নিয়ম শৃঙ্খলাই রক্ষা করে না, বরং সমাজকে সক্রিয় ও গতিশীল রাখে।

অধ্যাপক টিবি বটোমোর (Prof. TB Bottomore) সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ এ দু'ভাগে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে পরিবার, আইন আদালত, ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক রীতি-নীতি- ইত্যাদি। অপরপক্ষে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলতে শিক্ষা, জনমত, মূল্যবোধ, সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, সামাজিক আদর্শ ইত্যাদি। সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমেও মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজকর্ম

সামাজিক নিয়ন্ত্রনের সংজ্ঞা

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন (Means of Social Control) : সমাজের প্রচলিত আদর্শ, মূল্যবোধ, বিধিবিধান ইত্যাদি সামাজিককীকরণ এবং আত্মস্মীকরণ (Socialization and internalization) হলো সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মূল উৎস। আধুনিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূহের মধ্যে রাষ্ট্র, আইন, ধর্ম, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্পকলা ও সাহিত্য, গণমাধ্যম, জনমত, লোকাচার, লোকনীতি, আচার অনুষ্ঠান, সামাজিক নীতিমালা পুরস্কার ও শাস্তি, আদব কায়দা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সমাজবিজ্ঞানীরা জনমতকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজকর্ম

সামাজিক নিয়ন্ত্রন ও সমাজকর্ম

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সমাজকর্মের প্রায়োগিক সম্পর্ক রয়েছে। সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলনের মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করে তোলা যায়।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রতিনিধি হিসেবে সেবা প্রদান (Serving as agents of social control) সমাজকর্মের পেশাগত ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত। সমাজে এমন কিছু ব্যবস্থা (Systems) রয়েছে (যেমন বিচার ব্যবস্থা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা), যেগুলো সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এজেন্ট হিসেবে জনগণকে সেবা দিয়ে থাকে। সমাজে যেসব লোকের বিচ্যুত আচরণ অন্যান্যদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত করে, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আদালত, কারাগার, সংশোধনাগার, আইন, মানসিক হাসপাতাল প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত।

সমাজকর্মীরা বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক সংগঠন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসেবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এজেন্ট হিসেবে ভূমিকা পালনের বৈধতা ও স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রতিনিধি হিসেবে সমাজকর্মীর সুনির্দিষ্ট ভূমিকার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজকর্ম

সামাজিক নিয়ন্ত্রন ও সমাজকর্ম

সামাজিক নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি হিসেবে সমাজকর্মী সামাজিক শৃংখলা বিরোধী বিচ্যুত আচরণ তত্ত্বাবধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করেন। প্রবেশন, কিশোর অপরাধ সংশোধনাগার, কিশোর আদালত, কারাগারে পরিচালিত বৃত্তিমূলক কার্যক্রম প্রভৃতি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সমাজকর্মী পালন করেন। সমাজকর্মী যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সে প্রতিষ্ঠানে নারী ও শিশু নির্যাতন, মাদকাসক্তি প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ উপস্থাপন করতে পারেন। দিবাযত্ন কেন্দ্র, দত্তক কেন্দ্র (Foster homes), শিশুকল্যাণ প্রতিষ্ঠান, নার্সিং হোম, প্রবীণ নিবাস প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণের মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এজেন্ট হিসেবে সমাজকর্মী ভূমিকা পালন করে থাকেন। সমাজকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্র হিসেবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলো যেমন পরিবার, স্কুল, আইন, সামাজিক নীতি, সামজিক আদর্শ ও সামাজিক মূল্যবোধ বিবেচিত। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজকর্ম অনুশীলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ১৬ সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার

টপিক ১৬: সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার

পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশে যেসব উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, সেগুলোর মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার আন্দোলন অন্যতম। পেশাদার সমাজকর্মের অনেক কিছুই অতীতের সমাজ সংস্কারকদের সাধনা ও প্রচেষ্টার ফল। সামাজিক আন্দোলন এবং সমাজ সংস্কারের মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার

সামাজিক আন্দোলন

সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার লক্ষ্যের দিক হতে সমধর্মী এবং পরস্পর সম্পর্কিত। প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগত দিক হতে উভযের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মানব ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলনের উদাহরণ পাওয়া যায়। সামাজিক আন্দোলনের প্রভাবে সমাজে ক্ষতিকর প্রথার বিলোপ এবং কল্যাণকর প্রথা প্রবর্তিত হয়।

সামাজিক আন্দোলন হলো যৌথ প্রচেষ্টা, যার লক্ষ্য প্রত্যাশিত সামাজিক পরিবর্তন সাধন এবং অপ্রত্যাশিত সামাজিক পরিবর্তন প্রতিরোধ। সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী, "সামাজিক আন্দোলন হলো এমন একটি যৌথ কার্যক্রম ও উদ্যোগ, যাতে সাধারণত জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশের প্রতিনিধি হিসেবে একাধিক লোক সম্পৃক্ত হয়ে কোন আইন, সরকারি অথবা সামাজিক আদর্শ পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়।" (Social movement is an organized effort usually involving many people representing a wide spectrum of the population change a law, public policy or social norm.) সামাজিক আন্দোলনের উদাহরণ হলো বিভিন্ন সাম্যভিত্তিক মানবাধিকার আন্দোলন (Equal human rights movement) এবং বর্তমান সময়ের পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন।

সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার

সমাজসংস্কার

সামাজিক আন্দোলন ও সমাজকর্ম (Social Work and Social Movement) : সমাজকর্ম অনুশীলন সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলে না; কিন্তু প্রচলিত সামাজিক আন্দোলন সমাজকর্মীর কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে। অনেক সময় সমাজের উন্নয়ন এবং সামাজিক প্রগতিকে সামাজিক আন্দোলন প্রভাবিত করে। যেমন- পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন এবং নাগরিক অধিকার আন্দোলনের মতো সামাজিক আন্দোলন প্রগতিশীল সমাজ গঠনের সহায়ক। সমাজকর্মীরা তাদের পেশাগত মূল্যবোধের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এরূপ সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে। গণতন্ত্র, বর্ণবাদের শিকার সংখ্যালঘুদের অধিকার, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন ও সমস্যা, শিশু ও নারী অধিকার সংরক্ষণ এবং মানব উন্নয়ন ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে সমাজকর্মীরা নিজেদের পেশাগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে সম্পৃক্ত হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে নারী অধিকার আন্দোলন, শিশু অধিকার আন্দোলন, বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন, পরিবেশ বাঁচাও (Save environment) ইত্যাদির উদাহরণ দেয়া যায়। নারী অধিকার সংশ্লিষ্ট সামাজিক আন্দোলনের প্রভাবে বর্তমান বিশ্বের নারী সমাজ সমান অধিকার প্রয়োগ এবং নেতৃত্বের আসনে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছে। বর্ণবাদের শিকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নাগরিক অধিকার বলবত হয়েছে এবং আর্থ-সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার

সমাজসংস্কার

নিউ স্ট্যান্ডার্ড এ্যানসাইক্লোপেডিয়া (New Standard Encyclopaedia)-র ব্যাখ্যানুযায়ী, "সমাজসংস্কার হলো এমন এক কার্যক্রম, যা সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক আইন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণি অথবা সমগ্র সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত।"

Encyclopaedia of Social Work in India (1987) গ্রন্থে সমাজসংস্কারকে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত ভূমিকা, সামাজিক আচার-আচরণের ধরন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত পরিবর্তনের সুচিন্তিত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত কার্যক্রম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সমাজসংস্কার হলো উদ্দেশ্য প্রণোদিত সুচিন্তিত কার্যক্রম, যাতে জনশিক্ষা ও প্ররোচনার মতো প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে মানুষের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, প্রত্যাশিত ভূমিকা এবং আচার-আচরণের ধরন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো হয়।

সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার

সমাজসংস্কার

সমাজব্যবস্থা বা তার কোন অংশের ত্রুটিপূর্ণ ক্রিয়া দূরীকরণ বা সংশোধনের লক্ষ্যে পরিচালিত সাধারণ আন্দোলন অথবা ঐ আন্দোলনের নির্দিষ্ট ফলশ্রুতিকেই সমাজসংস্কার বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে ১৮২৯ সালের সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইনের উল্লেখ করা যায়। রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের লক্ষ্যে যে আন্দোলন গড়ে উঠে, তা হলো সমাজসংস্কার আন্দোলন। আর ঐ আন্দোলনের ফলে প্রণীত সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন-১৮২৯ হলো সমাজসংস্কার। কারণ, এর ফলে সতীদাহের মতো অমানবিক প্রথা সমাজ কাঠামো হতে উচ্ছেদ করা হয়।

সমাজবিজ্ঞানী ওগবার্ণ এবং নিমকফ-এর মতে, "সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য হলো সমাজের সংশোধন বা দোষ-ত্রুটির অপসারণ।" সমাজব্যবস্থা হতে ক্ষতিকর প্রথা-প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি সংশোধন এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে বাঞ্ছিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করাই সমাজসংস্কারের লক্ষ্য।

সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার

সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কারের সম্পর্ক

সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কারের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতি ও পরিচালনার পদ্ধতির দিক হতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের উদ্দেশ্য সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণ। সমাজসংস্কার প্রধানত প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ত্রুটি সংশোধন অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সীমিত পরিধিতে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে সামাজিক আন্দোলন বৃহত্তর পরিধিতে সংগঠিত হয়। যেমন নাগরিক অধিকার আন্দোলন, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপৃত। সামাজিক আন্দোলনের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিসর হিসেবে সমাজসংস্কারকে চিহ্নিত করা যায়। তবে উভয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো মানুষের কল্যাণ ও সমাজের উন্নয়ন।

সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার

সামাজিক আন্দোলন, সমাজসংস্কার এবং সমাজকর্ম

পেশাদার সমাজকর্মের মূল উৎস বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে নিহিত। ষোল শতাব্দীতে ইংল্যা-সহ সমগ্র ইউরোপে গড়ে উঠা বিভিন্ন সংস্কারধর্মী সামাজিক আন্দোলনের ফল হলো পেশাদার সমাজকর্ম। সমাজসংস্কার এবং সমাজকর্মের মধ্যে প্রায়োগিক সম্পর্ক রয়েছে। পেশাদার সমাজকর্মের ভিতর রচনা করে সমাজসংস্কার।

ষোল শতকে সমগ্র ইউরোপে মধ্যযুগীয় রক্ষণশীল চিন্তাধারার অবসান ঘটিয়ে চিন্তার জগতে নবজাগরণ বা রেনেসাঁর সূচনা হয়। রেনেসাঁর প্রভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মানবতাবাদ আন্দোলন (Humanism movement) শুরু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় উনিশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংল্যা- ও আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক দান আন্দোলন (Scientific Philanthrophy Movement), দান সংগঠন আন্দোলন (Charity Organization Movement), বসতি আন্দোলন (Sattlement Movement) গড়ে উঠে। এসব আন্দোলনের প্রভাবে সমাজকর্ম স্বেচ্ছাসেবী সমাজসেবা কার্যক্রম হতে বৃত্তির পর্যায়ে উপনীত হয়।

সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার

ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজসংস্কার আন্দোলন

উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে প্রগতিশীল ও আধুনিক চিন্তাধারার অধিকারী বিশিষ্ট হিন্দু মুসলিম নেতাদের নেতৃত্বে, অনেকগুলো সমাজসংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠে। সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূরীকরণ, ধর্মীয় সংস্কার সাধন, পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি উদ্দেশে এসব সংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠে। এসব আন্দোলনের প্রভাবে ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। এখানে অবিভক্ত ভারত বাংলাদেশের সতীদাহ উচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণ সংশ্লিষ্ট সমাজসংস্কার আন্দোলন আলোচনা করা হলো।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ১৭ সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন

টপিক ১৭: সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রচলিত হিন্দু সমাজের কুসংস্কার, সামাজিক অনাচার, বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীদের 'অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কতিপয় মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন সমাজ চিন্তাবিদদের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে উঠে। এসব আন্দোলনের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় এর সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন সমাজসংস্কারের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। উল্লেখ্য রাজা রামমোহন রায় ১৭৭২ সালের ২২ মে অবিভক্ত বাংলার হুগলী জেলার রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন।

সামাজিক কুসংস্কার ও বর্ণভেদ প্রথায় জর্জরিত প্রচলিত হিন্দু ধর্ম এবং সমাজসংস্কারের জন্য ১৮১৫ সালে রাজা রামমোহন রায় আত্মীয় সভা গঠন করেন। ১৮২৮ সালে আত্মীয় সভার অধিক সংখ্যক সদস্য নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করেন।

সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন

ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান লক্ষ্য ছিল অসাম্প্রদায়িকভাবে হিংসাবিদ্বেষ মনে না রেখে, ছবি ও প্রতিমূর্তি প্রতীক ব্যবহার না করে একক স্রষ্টা ও প্রতিপালকের উপাসনা করার জন্য সভা সমিতি গঠন করা। বিভিন্ন সভা সমিতির মাধ্যমে জগত স্রষ্টার ধ্যান-ধারণার উন্নতি ও সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকদের মাঝে ঐক্য বন্ধন দৃঢ় করার জন্য উপদেশ ও প্রার্থনার আয়োজন করা। মূর্তিপূজা, কুসংস্কার, সামাজিক অনাচার এবং বর্ণবৈষম্য দূর করে একেশ্বরবাদ ও সামাজিক সাম্য প্রচার করা ছিল ব্রাহ্ম সমাজের মূল লক্ষ্য। ভারতকোষে উল্লেখ রয়েছে, সামাজিক ঈশ্বর উপাসনা প্রবর্তনের সঙ্কল্প নিয়েই রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্ম সামাজের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য, সে সময় ধর্মসভা নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ধর্মসভা ছিল গোড়া হিন্দু সমাজের মুখপাত্র। পক্ষান্তরে ব্রাহ্ম সমাজ ছিল উন্নত ও উদার মতাবলম্বী হিন্দু সম্প্রদায়ের মিলনস্থল।

সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন

সতীদাহ উচ্ছেদ আন্দোলন: সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে সতীদাহ প্রথার মতো নিষ্ঠুর ও অমানবিক প্রথার বিলোপ সাধন। ধর্মের দোহাই দিয়ে স্বামীর নরকবাসের ভয় দেখিয়ে বিধবা পত্নীকে জোর করে স্বামীর চিতায় জীবন্ত দাহ করার প্রথাই নিষ্ঠুর অমানবিক সতীদাহ প্রথা। সতীদাহের নামে দড়ি দিয়ে বেঁধে, বিধবার অসহায় আর্তনাদকে ঢাক ঢোলের এবং দর্শকদের উল্লাসিত চিৎকারে নিমগ্ন করে এক পৈশাচিক পদ্ধতিতে নারী হত্যা অনুষ্ঠিত হতো। ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের পর ওয়ারেন হেস্টিংস কয়েকজন ব্রাহ্মণের সাহায্যে হিন্দু আইন সঙ্কলন করেন। এতে সতীদাহ প্রথার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে, “পতির চিতায় পুড়ে মরলে সান্দ্বী সতী মানুষের গায়ে যত লোম, ততো বছর অর্থাৎ সাড়ে তিন কোটি বছর পতিসহ সুখে স্বর্গে বাস করবে। তার পতির পিতৃ-মাতৃ উভয়কূলের তিন পুরুষ পাপ মুক্ত হবে। সহমরণের মতো পত্নীর আর কোন মহৎ কর্তব্য নেই। এ জন্মে এটি অবহেলা করলে পরজন্মে তার পশু জন্ম হবে।"

সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন

১৮১৫ হতে ১৮২৮ সালের মধ্যে শুধু অবিভক্ত বাংলায় ৮,১৩৪ টি সতীদাহ ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে অমানবিক ঘটনা হলো ১৮১৮ হতে ১৮২০ সালের মধ্যে যারা সতী হয়েছিল তাদের মধ্যে তিনজনের বয়স আট বছর এবং ৪৩ জনের বয়স নয় হতে ষোল বছরের মধ্যে ছিল। ১৮২৩ সালে ৭৫৭ জন সতীর মধ্যে ৩২ জনের বয়স বিশ বছরের নীচে ছিল। ১৭৯৯ সালে নদীয়ার এক কুলীন ব্রাহ্মণের ৪০জন পত্নীর মধ্যে ১৮জন পত্নী জীবিত ছিল। তাদের সকলের সহমৃত্যু হয়।

সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন

রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে গড়ে উঠা আন্দোলনের ফলে লর্ড বেন্টিংক ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর আইন জারি করে সতীদাহ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করেন। এর বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। তারা সতীদাহ নিষিদ্ধকরণ প্রত্যাহারের আবেদন জানান। বেন্টিংক প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের দাবি প্রত্যাখান করেন। অতঃপর প্রাচীনপন্থীরা বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলের (King-in-Council) নিকট আপীল করে। রামমোহন রায় সতীদাহ আইনের সমর্থনে ব্যক্তিগতভাবে প্রিভি-কাউন্সিলের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের আপীল অগ্রাহ্য হয়।৪০ রাজা রামমোহনের প্রচেষ্টায় নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা চিরতরে উচ্ছেদ হয়।

বাল্যবিবাহ রদ, নারী শিক্ষার প্রসার, অসবর্ণ বিবাহ সঙ্গতকরণ প্রভৃতি সামাজিক সংস্কার সাধনে রাজা রামমোহন গঠিত ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকা ছিল অগ্রণীয়। ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে হিন্দু সমাজ আধুনিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে সক্ষম হয়। যা তাদেরকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সচেতন করে তোলে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ১৮ হিন্দু বিধবা বিবাহ আন্দোলন

টপিক ১৮: হিন্দু বিধবা বিবাহ আন্দোলন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

হিন্দু বিধবা বিবাহ আন্দোলন

মানবতাবাদী ও আধুনিক চিন্তাধারার ধারক এবং বাহক বিখ্যাত সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রথা প্রবর্তনের জন্য সমাজসংস্কারের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ১৮২০ সালে পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। সাধারণ দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও স্বীয় প্রতিভা এবং কর্মগুণে মহান পণ্ডিত ও বিখ্যাত সমাজসংস্কারক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হন। কর্মজীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি শিক্ষার ও সমাজসংস্কারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে সমাজসেবা ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে তার অসামান্য অবদান ফুটে উঠে।

ঈশ্বরচন্দ্র নিজে শিক্ষিত, পণ্ডিত ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। তাই সমাজ জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তিনি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কর্মজীবনে তিনি যেমন শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতায় আজীবন নিয়োজিত ছিলেন, তেমনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যাপক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেন।

হিন্দু বিধবা বিবাহ আন্দোলন

হিন্দু বিধবা বিবাহ আন্দোলন : বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার কার্যাবলির মধ্যে হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রচলন অন্যতম। তৎকালীন হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহের ব্যাপক প্রচলন থাকায় বাল্য বৈধব্যের সংখ্যাধিক্য অত্যধিক হারে বেড়ে যায়। বিশেষ করে রাজা রায়মোহনের প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন প্রণয়নের প্রভাবে হিন্দুসমাজে বিধবাদের হার বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় বিবাহের সুযোগ না থাকায় বিধবারা সামাজিক, আর্থিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে অমানবিক অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করতো। বিবাহের পর হিন্দু আইনে পিতার সম্পতিতে কন্যার উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি না থাকায় বিধবারা স্বামী এবং পিতার পরিবারে অমানবিক পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হতো। বিধবাদের অমানবিক জীবনধারার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের প্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে এটি অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সৎকর্ম করতে পারব তার সম্ভাবনা নেই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হয়েছি এবং আবশ্যক হলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরান্মুখ নই। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের জন্য যা উচিত, আবশ্যক বোধ হলে তা করব। লোকের বা কুটুমের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হব না।"

হিন্দু বিধবা বিবাহ আন্দোলন

পরিশেষে লর্ড ডালহৌসীর সহায়তায় ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আইন প্রণয়নে সক্ষম হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বীয় পুত্রের সঙ্গে এক বিধবার বিবাহ দিয়ে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কুলীন ব্রাহ্মণদের স্বার্থে হিন্দু সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলনের বিরুদ্ধে তিনি সদা সোচ্চার ছিলেন।

হিন্দু সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামী, কঠোর বর্ণবৈষম্য, কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সহকারে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন বিদ্যাসাগর। সমাজসংস্কারের ইতিহাসে তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ১৯ নারীশিক্ষা আন্দোলন

টপিক ১৯: নারীশিক্ষা আন্দোলন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

নারীশিক্ষা আন্দোলন

বিংশ শতকের প্রথম দিকে অশিক্ষা, অজ্ঞতা, ধর্মীয় গোঁড়ামীর প্রভাবে অবরোধবাসিনী নারী অধিকার আদায়ে অবিভক্ত বাংলায় যার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়, তিনি হচ্ছেন মহিয়সী বেগম রোকেয়া। তিনি তার জীবনের ব্রত হিসেবে শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম নারী সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণকে গ্রহণ করেছিলেন। উনিশ শতকের মুসলিম নারী সমাজ এবং বিংশ শতকের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম নারী সমাজের মধ্যে তুলনা করলে বেগম রোকেয়ার নারী জাগরণ ও উন্নয়নের স্বার্থকতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। সমাজসংস্কারের ইতিহাসে তিনি নারী জাগরণের অগ্রদূতী বা মুক্তি ধাত্রী হিসেবে স্বীকৃত। রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে ১৮৮০ সালে ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর ৫২ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নারীশিক্ষা আন্দোলন

বেগম রোকেয়ার জন্ম এমন এক সময়ে, যখন সমাজে পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি এবং মুসলিম পরিবারে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। বেগম রোকেয়ার অদম্য আগ্রহ এবং বড় ভাই ইব্রাহীম সাবির, বড়বোন করিমুন্নেছা ও স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের ঐকান্তিক সহযোগিতায় ঘরে বসেই তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে লেখাপড়া শেখেন। মুসলিম নারী জাগরণের ক্ষেত্রে যেমন তার অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে, তেমনি সমাজসংস্কারেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি একাধারে মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূতী, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী, সাহিত্যকর্মী এবং সমাজসংস্কারক হিসেবে ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন।

নারীশিক্ষা আন্দোলন

নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণ: নারী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ও সম্প্রসারণ, অবরোধ প্রথার অবসান এবং মুসলিম নারী মুক্তি আন্দোলন তথা জাগরণের অগ্রদূতী হিসেবে বেগম রোকেয়ার চিন্তা ও কর্মধারা পর্যালোচনা করলে দু'টি বিশেষ দিক স্পষ্ট হয়ে উঠে। নারী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ও সম্প্রসারণ এবং অবরোধ প্রথার অবসান।

১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা হয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যে ভাগলপুর থেকে কোলকাতা লোয়ার সার্কুলার রোডে স্কুলটি স্থানান্তর করা হয়। ১৯১১ সালে কোলকাতায় স্কুলটি স্থায়ীভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে বেগম রোকেয়া মুসলিম নারীদের আধুনিক শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি আধুনিক সমাজকল্যাণের গুরুত্বপূর্ণ নীতি উদ্বুদ্ধকরণ এর সাহায্যে ঘরে ঘরে গিয়ে পরিবারের সদস্যদেরকে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝাতে চেষ্টা করেন। ১৯২৯ সালে তাঁরই প্রচেষ্টায় কোলকাতায় 'মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি শুধু নারী শিক্ষা প্রসারই চাননি, সমাজসংস্কারের মাধ্যম হিসেবেও শিক্ষাকে বিবেচনা করেছেন।

নারীশিক্ষা আন্দোলন

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে পর্দাপ্রথা যাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করতে পারে সেজন্য তিনি অবরোধ ও পর্দা প্রথা সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেন। অবরোধ এবং পর্দা দু'টি ভিন্ন জিনিস। অবরোধ হচ্ছে ঘরে বন্দী, ধর্মীয় গোঁড়ামী, পর্দার ব্যাপারে অহেতুক বাড়াবাড়ি। অন্যদিকে, পর্দা হচ্ছে নারীর স্বাভাবিক পবিত্রতা রক্ষার অন্যতম মাধ্যম যার সঙ্গে উন্নতি বা শিক্ষার কোন বিরোধ নেই।

বেগম রোকেয়া শুধু নারী শিক্ষার প্রসার এবং অবরোধ প্রথার বিলোপ সাধনের মাধ্যমেই তার কর্মধারা সীমিত রাখেননি। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে ও রাষ্ট্রে যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণে মুসলিম নারীসমাজকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলারও প্রচেষ্টা চালান। শিক্ষার পর মহিলাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশ এবং অধিকার সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ১৯১৬ সালে তিনি "আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম" বা 'মুসলিম মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির অন্যতম ছিল দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ দান। বহু অভাবগ্রস্ত বালিকা, সমিতির অর্থে শিক্ষা লাভ করেছে। সমবেত এবং সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় মুসলিম নারীদের অগ্রগতি ও কল্যাণসাধনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম।

নারীশিক্ষা আন্দোলন

নারী শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে অবরোধবাসিনী মুসলিম নারী সমাজ অবরোধের দেয়াল অতিক্রম করে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বীয় অধিকার আদায়ে এগিয়ে আসে। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলনে আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম সমিতি অংশগ্রহণ করে বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। নারী শিক্ষা ও নারী জনগণের স্বার্থে বেগম রোকেয়া বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি 'নিখিল ভারত মুসলিম মহিলা সমিতি' এবং 'বেঙ্গল উইম্যান্স এডুকেশন্যাল কনফারেন্স'-এর আজীবন সদস্য ছিলেন।

নারীশিক্ষা আন্দোলন

বেগম রোকেয়ার সাহিত্য কর্মকে তৎকালীন মুসলিম নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের 'Change Agent' বা পরিবর্তনের বাহক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর সাহিত্য কর্মের মূল লক্ষ্য ছিল নির্যাতিত, অবহেলিত, অজ্ঞ ও অশিক্ষিত নারী সমাজকে শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা। তিনি বিভিন্ন রূপক ব্যবহার করে, নারী সমাজের কর্মপ্রতিভা, কর্মশক্তি, সমস্যা ও তাঁর সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের ভবিষ্যত বংশ রক্ষার জন্য দুটো বিষয় দরকারী। নারীশিক্ষার বহুল প্রচার এবং বাল্য বিবাহ রহিত করা।

নারী সমাজকে অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অবরোধের অভিশাপ থেকে উদ্ধারের জন্য বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও জাগরণের বাণী নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। নারী পুরুষকে সমাজের দু'টি চক্ষু হিসেবে বিবেচনা করে নারীদের কল্যাণকে জীবনের মূল ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বেগম রোকেয়া তার সামগ্রিক নারী শিক্ষা কার্যাবলির জন্যই মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূতী অভিধায় ভূষিত হয়েছেন। নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তৎকালীন স্টেটম্যান পত্রিকা মন্তব্য করেছিল, "She devoted her life and all the resources to the cause of education for girls" অর্থাৎ নারী শিক্ষার জন্য তিনি তার সমগ্র জীবন ও সব সম্পদ উৎসর্গ করেছিলেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ২০ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. মানবপ্রেম ও ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে পরিচালিত সমাজসেবার উদাহরণ কোনটি?

ক. ওয়াকফ
খ. সমাজসেবা
গ. সমাজকল্যাণ
ঘ. সামাজিক পরিকল্পনা

২. ইংরেজি Charity শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

ক. ল্যাটিন
খ. পর্তুগীজ
গ. ফার্সী
ঘ. স্প্যানিশ

৩. নিচের কোনটি বাংলার সনাতন সমাজসেবার উদাহরণ?

ক. জাকাত
খ. বায়তুল মাল
গ. দেবোত্তর
ঘ. ধর্মগোলা

৪. বাংলা কত সালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছিল?

ক. ১১৭৬
খ. ১২৭৬
গ. ১৩৭৬
ঘ. ১৪৭৬

৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় খাদ্য সমস্যা ও দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়?

ক. লঙ্গরখানা
খ. সরাইখানা
গ. ধর্মগোলা
ঘ. এতিমখানা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬. হিন্দু ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান হলো-

ক. দেবোত্তর　　খ. বিদ্যাদান

গ. অভয় দান　　ঘ. অনুদান

৭. বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মানবহিতৈষী দর্শন ও পেশাগত দক্ষতার উপর ভিত্তিশীল সুসংগঠিত কার্যক্রম হলো-

i) সমাজসেবা　　ii) সমাজকল্যাণ　　iii) সমাজকর্ম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. I　　খ. ii এবং i

গ.ii　　ঘ. Ii

৮. কোন সনাতন সমাজসেবা প্রথার উপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ঈদগাহ, মন্দির, অনাথ আশ্রম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত?

i) দেবোত্তর প্রথা　　ii) ওয়াকফফ　　iii) জাকাত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. Ii　　খ. ii এবং i

গ. ii এবং iii　　ঘ. iii এবং i

উদ্দীপকটি পড় এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

পটুয়াখালী জেলার অনেক উপজেলায় প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিডরের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়। এতে অসংখ্য লোক মারা যায়। অনেক শিশু পিতৃ মাতৃ হারা হয়ে পড়ে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক দুর্গত জনগণের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম, আহছানিয়া মিশনের মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দুগর্ত জনগণের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সিডর পরবর্তীকালে দুগর্ত এলাকার লোকজন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে খাদ্যগুদাম তৈরি করে।

৯. দুগর্ত এলাকার মাতৃপিতৃহীন শিশুদের পুনর্বাসনে কোন প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট?

ক. এতিমখানা
খ. লঙ্গরখানা
গ. সরাইখানা
ঘ. দাতব্যালয়

১০. খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে যে ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান সর্যশ্লিষ্ট তা হলো-

i) লঙ্গরখানা
ii) বায়তুল মাল
iii) ধর্মগোলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. Iii
খ. ii
গ. ii এবং iili
ঘ. i এবং ii

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ

টপিক – ২১ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

কামাল সাহেব একজন পেনশনভোগী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কমকর্তা। তিনি ইউনিয়ন পরিষদের একজন জনপ্রিয় চেয়ারম্যান। তার এলাকায় বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যাবলি বাস্তবায়ন করে দুঃস্থ মানুষের উপকার করছেন। এলাকার জনগণ তাকে সমাজকর্মী হিসেবে সম্মান করে। বয়স্কভাতা, রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত মহিলাদের ভাতা প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে কামাল সাহেব তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করেন।

ক. সমাজকল্যাণ কাকে বলে?

খ. সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণের মূল পার্থক্য কী?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক নিরাপত্তার ধরনগুলো ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কামাল সাহেব মূলতঃ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করছেন। -ব্যাখ্যা কর।

THANK YOU